# নগর নন্দিনী

# নগর নন্দিনী

শংকর

॥ কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

# নগর নন্দিনী

কলকাতায় এসপ্ল্যানেড পেরিয়ে ডালহৌসিগামী একত্রিশ নম্বর ট্রাম পশ্চিমদিকের রাজভবনকে একটা হাল্কা টুং-টাং ঘণ্টা-সেলাম জানাতেই পল্টু বলে উঠলো, "মিতাদি, এবার উঠতে হবে।"

ওরা দুজনে ট্রামের বাঁদিকে সীট দখল করে বসেছিল। পল্টুর মিতাদি, অর্থাৎ পারমিতা মুখার্জি, হাতব্যাগটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে সীট ছেড়ে উঠবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলো। পল্টু বললো, "সামনেই আমাদের ডেড লেটার অফিস—দুনিয়ার ঠিকানা-হারানো বেওয়ারিশ চিঠিদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের গভরমেন্ট আবার 'মরা' কথাটা আজকাল মোটেই পছন্দ করেন না, তাই ডেড লেটার অফিসের নতুন নাম দিয়েছেন রিটার্নড্ লেটার অফিস।"

পল্টু কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। কারণে অকারণে হুল ফুটোবার বয়স ওটা। পারমিতা ওর ভাবভঙ্গী কথাবার্তায় বেশ মজা পাচ্ছে। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসি চাপবার চেষ্টা করলো। অপরিচিত শহরে অপরিচিত ট্রামের পরিবেশে এই ধরনের কথাবার্তায় উৎসাহ দিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ কী?

বেপরোয়া পল্টু নিজের মনেই বললো, "মিতাদি, তুমি তো এই নগরের নতুন নন্দিনী। আজব কলকাতার হালচাল ভাল করে বুঝে নাও।" ট্রামের জানালার বাইরে আঙুল বাড়িয়ে পল্টু বললো, "দু পা এগোলেই বি-বি-ডি বাগ। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে নাম ছিল ডালহৌসি স্কোয়ার। আমাদের সহৃদয় সরকার-বাহাদুর এক ঢিলে তিন পাখী মারার ফাঁদে পড়লেন। ফোকটে তিনজন বিপ্লবীকে নিত্যস্মরণীয় করবার মতলবে নতুন নাম দিলেন—বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। স্মৃতিফলক বসলো, মন্ত্রীদের ছবি কাগজে বেরুলো, সরকারী গেজেটে নতুন নামও ঘোষণা হলো—কিন্তু এতো বড়ো নাম বলতে গিয়ে লোকের হাঁপ ধরে যায়!

তিন সপ্তাহ যেতে-না-যেতে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের বদলে আমরা পেলুম এই বি-বি-ডি বাগকে। দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে বাঘা-বাঘা বিপ্লবী তো মরে বেঁচেছেন—রাইটার্স বিল্ডিংসের মন্ত্রীদের কাছে তাঁরা তো কিছুই প্রত্যাশা করেননি। তবু তাঁদের স্মৃতিকে এইভাবে হেনস্থা করার মানে কী?"

উঃ! ছেলেটার নজর তো খুব সজাগ, পারমিতা মনে মনে বললো। কিন্তু পল্টুকে মুখে কোনো সাহস জোগালো না পারমিতা। বেশি উৎসাহ পেলে এই ট্রামের মধ্যে একদল অপরিচিত লোকের সামনে পল্টু আরও কী বলে বসবে কে জানে! পল্টু বললে, "জানেন মিতাদি, এদেশে সবাই আমাদের ভালো করতে এগিয়ে আসেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্দ হয়ে যায়।"

কলকাতার ট্রামে-বাসে যে এতো রসিক শ্রোতা ছড়িয়ে আছেন তা পারমিতা জানতো না। পল্টুর কথাবার্তায় বেশ খুশী হয়ে সহযাত্রী এক ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "একেবারে আমূল বাটারের মতো একশ দশ পার্সেন্ট খাঁটি কথা বলেছো, ভাই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে আরম্ভ করে এই হাল আমলের সি-এম-ডি-এ পর্যন্ত কলকাতার পাবলিকের উপকারের জন্যে কতরকম ধানাই-পানাই করলে—কিন্তু প্রতিবার শিব গড়ত গিয়ে বাঁদর তৈরি হলো। সাধে কি আর পাবলিক এখন বলছে, ভিক্ষে দিতে হবে না, কুকুর সামলাও। যথেষ্ট ডেভেলপমেন্ট করিয়েছো—এখন আর গর্ত খুঁড়ে স্বখাত সলিলে ডুবিয়ে মেরো না।"

ট্রামের অনেক লোকই একসঙ্গে হেসে উঠলো। মুখে পানের পিক সামলে আর-এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "পরের বারে না-হয় ভোট পাবো না, তাই বলে কি বাঁশ দেবো না?"

রস-রসিকতার চলমান রঙ্গমঞ্চ এই ট্রামগাড়িটা পশ্চিম দিকে মোড় নেবার জন্যে প্রস্তুত হতেই পারমিতা ও পল্টু রাস্তায় নেমে পড়ল। পল্টু বললো, "এই ডেড লেটার অফিসের সামনে থেকে প্রত্যেক দিন ট্রাম-বাস ধরবেন আপনি, মিতাদি।"

বি-বি-ডি বাগের উত্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে পল্টু বললো, "চিনে

রাখুন, মিতাদি, ওই লাল বাড়িটা—আর-একটা ডেড লেটার অফিস. নাম রাইটার্স বিলডিংস ! ভুক্তভোগীরা বলে, ওখান থেকে কোনো চিঠির উত্তর আসে না।ওখানে যেই ঢোকে সেই স্ট্যাচু বনে যায়—বাইরে যতই সদিচ্ছা ও ক্ষমতা থাক, ওখানে ঢোকা মাত্রই নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু।"

"তোমার আমার দাদা, ভাই, বোনরাই তো ওখানে ঢোকে," পারমিতার ইচ্ছে হলো একবার পল্টুকে শুনিয়ে দেয়। কিন্তু হাত ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই খেয়াল হলো সাড়ে-ন'টা বাজতে আর মিনিট দশেক মাত্র আছে।

পল্টু আবার পথের নিশানা দিলো। "ট্রাম লাইন পেরোলেই যে-রাস্তাটা দেখছেন, আগে এর একটা পবিত্র নাম ছিল। স্বাধীন হয়ে আমরা তার জায়গায় মস্ত এক দিশী ঠিকেদারের নাম বসিয়ে দিয়েছি।"

• "আঃ", পারমিতা এবার পল্টুকে একটু বকুনি লাগালো।

সঙ্গে সঙ্গে কপট ক্ষমা চেয়ে পল্টু বললো, "ও ! আই অ্যাম স্যরি, মিতাদি। এই মিশন রো এক্সটেনশনেই তো আপনার নতুন অফিস—এই রাস্তাটা সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস না থাকলে কেমন করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাজ করবেন ?"

অফিসের নম্বরটা জেনে নিয়ে পল্টু বুঝিয়ে দিলো, "আপনার অফিসটা বেশী দূরে নয়। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ট্রাম লাইন পেরোতে হবে না।"

পল্টুকে এইখান থেকেই বিদায় করতে চাইলো পারমিতা। বললো, "তোমাকে তো আবার প্রেসিডেন্সি কলেজ যেতে হবে ? এখান থেকে ট্রাম পেয়ে যাবে নিশ্চয়।"

"মা বলে দিয়েছেন আপনাকে অফিসে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে যেন আমি কলেজে যাই," পল্টু আপত্তি জানালো।

মৃদু হেসে পারমিতা বললো, "চাকরিটা তো আমাকে করতে হবে ? সুতরাং অফিসটা খুঁজে বার করে নেবার অভ্যাসটা থাকুক।"

"এটা একটা ভাল পয়েন্ট তুলেছেন, মিতাদি।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পল্টু বললো, "দু-চার মিনিট লালদীঘিতে ঘুরে, আমি শ্যামবাজারের

ট্রাম ধরিগে যাই। জানেন মিতাদি, যে-রেটে এ পাড়ার কোম্পানিগুলো লালবাতি জ্বালছে, তাতে যখন আমরা কলেজ থেকে পাস করে বেরুবো, তখন বি-বি-ডি বাগের নাম হয়ে যাবে লালবাতি স্কোয়ার!"

চোখের কালো ফ্রেমের চশমাটা ঘামে একটু নেমে পড়েছিল। চশমাটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে পারমিতা এবার মিশন রো এক্সটেনশনের চলমান জনস্রোতের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলো। কলকাতা এক জরদগব শহর, সেখানে কিছুই এগোয় না—এ কথা পারমিতা সেই ছাত্রী অবস্থা থেকে শুনে এসেছে। কিন্তু কলকাতার অফিসপাড়ায় নিত্যযাত্রীরা যে এমন দ্রুতবেগে যাতায়াত করতে পারে তা পারমিতা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতো না। এরা হাঁটছে, না দৌড়াচ্ছে তা বোঝা দায়। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো পারমিতাকে প্রায় ধাক্কা মেরেই এগিয়ে গেলেন—মাসের পয়লা তারিখে তিনি কিছুতেই লেট করতে চান না।

পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরুবার কথাটা মনে পড়তেই পারমিতা একটু অস্বস্তি বোধ করলো। এমন ঘটনা বোধহয় একমাত্র এই দেশেই ঘটতে পারে। মেয়েরা যে একা-একা কিছু করতে পারে, জীবনপথে একা-একা চলবার মতো ক্ষমতা যে মেয়েদের দেহে ঈশ্বর যথাসময়ে দিতে ভোলেননি এ-কথা মেয়েদের গার্জেনরা এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি। না-হলে মায়ের বান্ধবী, প্রীতি মাসীমা পারমিতার সঙ্গে পল্টুকে পাঠাবার জন্যে অত জোর-জবরদস্তি করলেন কেন?

আজকালকার মেয়েদের যে আত্মসম্মানজ্ঞান টনটনে সে খবর মাসীমা রাখেন। তাই বললেন, "পরের মেয়ে দুদিনের জন্যে আমার কাছে থাকতে এসেছো, দায়-দায়িত্ব সব আমার। কিছু ঘটলে সীতাদি ভাববেন মেয়েটাকে আমি দেখলাম না। আর মিতা, মা লক্ষ্মী আমার, পাহারা বসিয়ে মেয়েকে আপিস পাঠানো যায় না, তা জানি আমি। কিন্তু তুই যে কলকাতা শহরে একেবারে নতুন—এখানকার পথঘাট গাড়িঘোড়া, হালচাল যখন বুঝে যাবি তখন কি আর আমি পল্টুকে বলবো তোকে অফিসে পৌঁছে দিতে?"

হ্যারিংটন ইন্ডিয়া লিমিটেডের অফিসে খবরটা গুজব আকারে গতকাল দুপুর থেকেই ছড়াতে আরম্ভ করেছিল। এই অফিসের বড় কর্তা কিপিং সায়েব এই ধরনের রটনাকে বলতেন গ্রেপভাইন নিউজ। তার থেকে বাংলা করা হয়েছিল—দ্রাক্ষাকুঞ্জ-সংবাদ।

দ্রাক্ষাকুঞ্জ থেকে খবরটা প্রথম সংগ্রহ করেছিলেন ইনভয়েস সেকশনের হেড টাইপিস্ট পাণ্ডবেশ্বরবাবু। পাণ্ডবেশ্বরবাবু খবরটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহকর্মী ও ছোট ভাই রত্নেশ্বরের কানে তুলে সাবধান করে দিয়েছিলেন—'এখনও টপ সিক্রেট, যেন কেউ জানতে না পারে।' রত্নেশ্বর খবরটা দাদার নির্দেশ মতো টপ সিক্রেটই রেখেছিলেন, শুধু ওরই মধ্যে সবার অলক্ষ্যে একবার টাইপ মেসিন ছেড়ে উঠে গিয়ে অ্যাকাউন্টসের ভোলানাথ রায়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য গুজব ছড়ানো নয়—আগাম খবর সাপ্লাই করে স্রেফ ভোলানাথবাবুকে একটু খুশী রাখা। ভোলানাথের বিবাহযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রটির সঙ্গে রত্নেশ্বর নিজের দ্বিতীয় কন্যার সম্বন্ধ পাতাবার সুযোগ খুঁজছেন।

ভোলানাথ রায়কে এ-অফিসের সবাই ইংরেজ আমলে মিস্টার রয়টার বলেই ডাকতো। ইদানীং নাম পাল্টে পি-টি-আই বাবু হয়েছেন। ভোলানাথবাবুর কাছে খবরটা যাওয়ার পর মন্ত্রবৎ কাজ শুরু হলো। এক থেকে দুই মুখ, দুই থেকে চার, চার থেকে ষোলো ইত্যাদি ধাপে ধাপে উচ্চতর গণিতের ফর্মুলা অনুযায়ী মাত্র বাইশ মিনিটে আপিসের সকলেই ব্যাপারটা জানতে পারলো।

টিফিনের সময় মশলা-মুড়ির ঠোঙা হাতে অবিনাশবাবু ইনভয়েস সেকশনের পাণ্ডবেশ্বরবাবুর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "শুনেছেন?"

টিফিন কৌটো থেকে রুটি ও আলু-চচ্চড়ি বার করে মুখে দেবার আগে পাণ্ডবেশ্বর বললেন, "ভগবান যখন একজোড়া কান দিয়েছেন তখন এ-আপিসে তো কতকিছুই শুনতে হচ্ছে। আপনি কোন খবরটার কথা বলছেন?"

অবিনাশবাবু বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার—হ্যারিংটন ইণ্ডিয়ার পঁচাত্তর বছরের হিস্‌ট্রিতে এমন খবর কেউ শোনেনি—কোম্পানিতে নাকি মেয়ে-অফিসার জয়েন করেছে?"

সামনের টেবিলে এই সময় নিয়মিত তাসের আসর বসে। কিন্তু আজ অনেকেরই যেন খেলায় মন নেই। সমরেশ চৌধুরী বললেন, "কোম্পানির যা অবস্থা! বাঘা বাঘা সায়েববাচ্চা জলে ভেসে গেলো এখন মেয়েমানুষ কী করবে!"

বিহারের রামধারীবাবুর এই সময়টা একটু তাস না খেললে মাথা ধরে। বন্ধু সমরেশকে বকুনি দিয়ে তিনি বললেন, "তুমি শালা কেরানী—হাই লেভেলে অফিসারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? যে অফিসার আসবে তাকেই আমরা সেবা করবো—সে ব্যাটাছেলেই হোক, মেয়েমানুষ হোক, আর....."

"থামলে কেন রামধারী সিং? ব্যাটাছেলে অথবা মেয়েমানুষ ছাড়া অফিসার আর কী হতে পারে?"

সহকর্মীর সুড়সুড়িতে দ্বারভাঙ্গা জেলার রামধারী সিং নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "জানো না? ছেলে হলে নেচে কুঁদে ঢোল বাজিয়ে যারা পয়সা রোজগার করে, ইংরেজ চলে যাবার পর তারাই তো মার্চেন্ট অফিসের হাই পোস্টে বসেছে। এই অফিসেই তো অনেকগুলো বৃহন্নলা ঘুরে বেড়াচ্ছে—দুবেলা তো চোখের সামনে তা দেখতে পাচ্ছো।"

আলোচনাটা অপ্রীতিকর হয়ে উঠুক তা বোধহয় স্টেনোগ্রাফার মিস্টার নটরাজনের ইচ্ছে নয়। রীতিমতো ইডিয়মেটিক বাংলায় নটরাজন বললেন, "ব্যাপারটা তাহলে সত্যি? লেডি অফিসার আসছেন তা হলে? আসুন, আমার কোনো আপত্তি নেই—শুধু এই বুড়ো বয়সে আমাকে

যেন মেয়েমানুষের ডিকটেশন নিতে না হয়।"

রত্নেশ্বর বলেন, "সে কথা আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি না। কোন স্টেনো কোন অফিসারের সঙ্গে অ্যাটাচড্ হবেন তা আজকাল পার্সোনেল অফিসার মিস্টার দেসা নিজে ঠিক করে। তোমার কোষ্ঠীতে যদি অধঃপতন এবং অবলাশাসন থাকে তো কে আটকাবে?"

পার্সোনেল অফিসার দেসা সায়েবের অ্যাসিসটেন্ট নীলমণিবাবু চুপচাপ বসে আছেন। নটরাজন প্রশ্ন করলেন, "নীলমণিবাবু, আপনি তো সবই জানেন—মুখ খুলছেন না কেন?"

বন্ধুর মুড়ির ঠোঙা থেকে একমুঠো মুড়ি ঢেলে নিয়ে নীলমণি বিশ্বাস বললেন, "এই তো সবে শুরু। হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে এবার কত খেল্ দেখতে পাবেন।"

উৎসুক বন্ধুরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নীলমণিকে অনুরোধ করলেন, "সব খবরই তো তোমার হাত দিয়ে যায়—একটু আগাম নমুনা ছাড়ো না, ব্রাদার।"

"আমাকে আজকাল কোম্পানি বিশ্বাস করে কই?" নীলমণিবাবু দুঃখ করলেন। "ব্যাটা পার্সোনেল অফিসার সমস্ত কনফিডেন্সিয়াল পেপার নিজের আলমারিতে রাখে—বাথরুমে যাবার সময় পর্যন্ত চাবির গোছাটা পকেটে নিয়ে যায়। সন্দেহবাতিক!"

নীলমণিবাবু এবার খোঁচা খেলেন। "অত অভিনয়ের দরকার কী? খবর লিক করবে না,তাই বলো। এই যে মেয়ে-অফিসার আসছে, তাও তুমি জানতে না, বলো। হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে আমাদের দিনকাল খারাপ—আমরা বিশ্বাস করে নেবো।"

"কোন মা কালীর দিব্যি—আমি কিসসু জানতাম না। আজ সকালে ব্যাটাচ্ছেলে সি ভি দেসা আমাকে হুকুম করলো—দরজায় লাগাবার জন্যে একটা নতুন নেমপ্লেট চাই। সম্ভব হলে আজকে বিকেলের মধ্যে চাই। আমি সঙ্গে সঙ্গে কুইন কোম্পানির নন্দবাবুকে ডেকে অর্ডার প্লেস করে দিয়েছি। এমন কিছু গোপন কম্ম নয়—হাজারবার দেখতে পাবে।"

আরও একটু আলো পাওয়া যাচ্ছে তা হলে। টিফিন টাইমের সময়

হ্যারিংটন ইন্ডিয়া লিমিটেডের বারগেনেবল স্টাফরা এবার নীলমণিকে প্রশ্ন করলেন, "মেমসায়েবটি কোত্থেকে আসছেন? নামটা কী?"

নীলমণিবাবু বললেন, "পুরো নামটাও শালা দেসা আমাকে বলে নি—ওটাও কনফিডেনসিয়াল ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে। সারনেম দিয়েছে—মুখার্জি। তার থেকে সেক্স বুঝবো কী করে?"

একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা মুহূর্তের জন্যে হলঘরের ওপর নেমে এলো—সভ্যরা মনস্থির করতে পারছেন না, তাঁরা খুশী হবেন, না বিরক্ত হবেন।

রত্নেশ্বরবাবু মন্তব্য করলেন, "তাও ভাল, পাঞ্জাবী মেয়েছেলে এনে হাজির করেনি।"

জগদীশবাবু একমত হতে পারলেন না। "ম্যাড্রাসী, পাঞ্জাবী, বাঙালী—তাতে আমাদের কী? সব গোখরা সাপের একই বিষ—সে তামিলনাড়ুরই হোক, আর তমলুকের হোক।"

"মন্দের ভাল আর কি", রত্নেশ্বরবাবু নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করলেন। "সায়েবরা যেদিন এদেশ থেকে তল্পিতল্পা গুটোতে শুরু করলো, সেদিন থেকেই আমাদের কষ্টের ইতিহাস শুরু হলো।"

"এসব কী বলছো দাদা", মিস্টার নটরাজন দুষ্টুমি করে রত্নেশ্বরবাবুকে উত্তেজিত করলেন।

"যা বলছি, ঠিকই বলছি নুটু",—নটরাজনকে অনেকেই আদর করে এখানে নুটুবাবু বলে ডাকে। "হেনেসি সাহেব যেদিন চলে গেলেন—সেদিন ইনভয়েস সই করাবার জন্যে ওঁর ঘরে গিয়েছিলাম। অমন জাঁদরেল সাহেব, কিন্তু যাবার দিনে একেবারে মাখনের মতো মোলায়েম হয়ে গিয়েছিলেন। সায়েব আমাকে বললেন, রটন, তোমরা যখন চাচ্ছো, তখন আমরা অবশ্যই চলে যাবো। কিন্তু একদিন তোমরা রিগ্রেট করবে, বুঝতে পারবে কী জিনিস হারালে তোমরা।"

আলোচনাসভায় কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এলো। হেনেসি সায়েবের সেই বিখ্যাত শেষ উক্তি মেনে নিতে স্বাধীনচেতা তরুণ কর্মীদের কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে, কথা একেবারে হেসে উড়িয়ে

দেবার মতো নয়। জগদীশবাবু এককালে স্বদেশী করেছেন, ওঁদের পরিবারের সঙ্গে এখনও রাজনীতির যোগাযোগ রয়েছে। তিনি মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "সায়েবরা চলে যাবার পরেও অনেক কোম্পানি হু-হু করে উন্নতি করেছে—স্টাফদের মাইনেপত্তর সুখসুবিধে তারা অনেক বাড়িয়েছে।"

হেনেসি সায়েবের একদা প্রিয় টাইপিস্ট 'রটন' বললেন, "নিজের ঘরের অবস্থাটা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে সায়েব সত্যদ্রষ্টা ছিলেন কিনা—কোথায় এখনও সোনা সস্তা তা জেনে আমাদের কী লাভ?"

জগদীশবাবু বললেন, "মেয়ে-অফিসারের আণ্ডারে কাজ করতে হবে—একথা কিন্তু ইংরেজ আমলে সত্যিই ভাবা যেত না। হোল আপিসে তখন মেয়েমানুষ বলতে দুজন : আমাদের ঝাড়ুদার জটাধারীর বউ সরসতীয়া আর বড় সায়েবের সেক্রেটারি মিসেস ক্যাম্পবেল—আমরা পিছনে ডাকতাম মিসেস অমাবস্যা বলে। যেমন মা কালীর মতো গায়ের রং, তেমনি মেজাজ—নিরীহ বাবুদের মুণ্ডু নেবার জন্যে বেটী যেন সব সময় খাই-খাই করছে। বেজায় কানপাতলা ছিলেন রেমিংটন সায়েব—সেক্রেটারি-মাগী কিছু বললে সাহেব তা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেবেন, একবার খুঁটিয়ে দেখবেন না কথাগুলো মাগীর বানানো কিনা।"

এসব পুরনো দিনের কথা, হ্যারিংটন ইণ্ডিয়ার ছোকরা কর্মচারীরা জানে না। তারা পুরো হিস্ট্রিটা শোনবার জন্যে জগদীশবাবুর টেবিলে ঝুঁকে পড়লো। স্টেনো টাইপিস্ট অধীর চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন, "তা ইউনিয়ন তখন কি আঙুল চুষছিল? কোনো প্রোটেস্ট বা গেট মিটিং হলো না?"

"আর জ্বালিও না", জগদীশবাবু বকুনি লাগালেন। "তোমরা বয়েজ অফ ইয়েস্টারডে, অফিসে ঢুকবার আগেই ইউনিয়ন চিনে রেখেছো। তখন ইউনিয়ন কোথায়? বছরে একবার শখের থিয়েটার ছাড়া সবার একসঙ্গে মেলামেশাই হতো না।"

অধীর চ্যাটার্জির ইউনিয়নে আগ্রহ আছে—ইউনিয়নের কাজকর্মও কিছুটা করে সে। নিজের মুড়ির ঠোঙাটা শেষ করে, কাগজটা গোল্লা

পাকিয়ে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, অধীর প্রশ্ন করলো, "মিসেস মা-কালীর শেষ পর্যন্ত হলো কী?"

"সে ভীষণ টপ সিক্রেট", জগদীশবাবু বুঝে উঠতে পারছেন না, এতোদিন পরেও সেসব কথা ফাঁস করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা।

সবাই একসঙ্গে চেপে ধরলো জগদীশবাবুকে। "বলুন না ব্যাপারটা, আমরা তো ঘরের লোক—আমরা আর কার কাছে লাগাতে যাবো?"

জগদীশবাবু বললেন, "তোমরা যখন কিছুতেই ছাড়বে না, তখন শোনো। ব্যাপারটা মাত্র তিনজন জানতো—আমি, ঝাড়ুদার জটাধারী আর বউবাজারের একজন—ধরো তার নাম মিস কে।"

গলাটা একটু কেশে সাফ করে নিয়ে জগদীশবাবু একটা কাঁচি সিগ্রেট ধরালেন। তারপর বললেন, "তখন আমরা ইউনিয়ন করতাম না—কিন্তু ইনডিভিজুয়ালি আমরা সহকর্মীদের নিজের ভায়ের থেকে বেশি ভালবাসতাম, সবার মঙ্গলের জন্যে যে-কোনো স্যাক্রিফাইস করতে পারতাম। আমরা ভুলতে পারতাম না—বিনয়, বাদল, দীনেশ আমাদের জাতভাই।"

"তার মানে, সেই যুগে অফিসে আপনারা টেররিজম শুরু করেছিলেন নাকি? মাই গড! এসব তো আমাদের জানা উচিত। কত সন্ত্রাসবাদীর কথা এইভাবে হারিয়ে গেছে এই মার্চেন্ট অফিস পাড়ায়, কে জানে?" চ্যাটার্জি দুঃখ করতে লাগলো।

জগদীশবাবু সিগ্রেটে একটা টান দিয়ে বললেন, "টেররিজম নয়, সন্ত্রাসবাদের বাবা। ধরা পড়লে নির্বংশ হতে হতো।"

"মানে?" অস্ফুট প্রশ্ন বেরিয়ে এলো একাধিক মুখ থেকে।

জগদীশবাবু বললেন, "মিসেস ক্যাম্পবেলের অত্যাচার যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠলো—অফিসার-মাগী যখন নিরীহ স্টাফদের মাথা কাটছে, তখনই মনে মনে স্থির করলাম অ্যাকশন করতে হবে।"

"অ্যাঁ। অ্যাকশন! নাইনটিন থার্টি সেভেনে অ্যাকশন স্কোয়াড ইন মিশন রো!" অধীর চ্যাটার্জি শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠলো।

জগদীশবাবু সগর্বে কিন্তু নির্বিকারভাবে বললেন, "জয়েন্ট অ্যাকশন,

ফলোড বাই মপিং আপ অপারেশন।"

"মপিং আপ? সেটা তো সি-আর-পিরা জনসাধারণের ওপর অত্যাচারের সময় করে", অধীর বাধা দিতে যাচ্ছিল।

"যা বলছি—শুনে যাও", বকুনি লাগালেন জগদীশবাবু। "আমাদের সিক্রেট অ্যাকশন স্কিমে আমরা টেররিস্ট মেথড, চাইনীজ মেথড, টেগার্ট মেথড এবং সি-আর-পি মেথড সবগুলোর সমন্বয় করেছিলাম। তখন তো আমাদের এতো লোকবল ছিল না—তখন আপনা হাত জগন্নাথ, আমরা একাই একশো।"

জগদীশবাবু বললেন, "ওই যে বললাম আপনা হাত জগন্নাথ, ওই প্রিন্সিপলে প্রথমে গোপনে বড় সায়েবের কাছে উড়ো চিঠি ছাড়লাম। থার্ড ডে-তে রি-অ্যাকশন পাওয়া গেলো। মিসেস মা-কালী রাগে হন্যে হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন—কাঁচা রক্ত খাবার বাসনা হয়েছে। জটাধারীর কাছে গোপনে খবর পেলুম, আমরা অফিস থেকে চলে যাবার পর, মাগী প্রত্যেকটা টাইপ মেসিনের টাইপ এগজামিন করেছে এবং জটাধারীকে দিয়ে বাবুদের কার্বন পেপারের বাক্স নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঘেঁটেছে—যদি কার্বন পেপার থেকে প্রমাণ উদ্ধার করতে পারে। আমিও কি অত বোকা! উড়ো চিঠির কার্বন পেপার কখন কুচিকুচি করে ছিঁড়ে পায়খানার কমোডে ফেলে দুবার ফ্লাশ টেনে দিয়েছি।"

"তারপর?" নটরাজন জিজ্ঞেস করলেন।

"তারপর, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম কোনো ফল হলো না। সায়েব ইউনেনিমাস লেটারের ওপর কোনো অ্যাকশন নেননি, বরং ওই অফিসার-মাগীর হাতেই চিঠিটা দিয়েছেন।"

অধীর চ্যাটার্জি ইংরিজিতে একটু স্ট্রং, বছরখানেক ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়েছিল। সে লজ্জিতভাবে বললো, "ইউনেনিমাস, না এনোনিমাস?"

"ওই হলো—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। আমরা সেসময় ইংলিশ কম্পোজিশন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না—ইংরেজের বিরুদ্ধে সিক্রেট অ্যাকশন নিয়ে দেহে তখন রোমাঞ্চ হচ্ছে।"

জগদীশবাবুকে সাপোর্ট করে নটরাজন বললেন, "দাদা যা বলেছেন,

ঠিকই বলেছেন। এনোনিমাসও বটে, আবার ইউনেনিমাসও বটে। চিঠিতে দাদা যা লিখেছেন, তা তখনকার প্রতিটি স্টাফের মনের কথা—কোনো দ্বিমত নেই—সুতরাং ইউনেনিমাস উড়ো চিঠি।"

নটরাজনের উপর খুশী হলেন জগদীশবাবু। বললেন, "নুটুটা ঠিক বুঝেছে—সব জিনিস উইথ রেফারেন্স টু দি কনটেকসট এক্সপ্লেন করতে গেলে ওভার কচলানো লেবুর মতো তেতো হয়ে যায়।"

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জগদীশবাবু আবার আরম্ভ করলেন, "যা হোক, যা বলছিলাম—মিসেস মা কালী দেওয়ালের লিখন পড়ে শান্ত তো হলেনই না, বরং আরও অত্যাচার বাড়ালেন। বেচারা জটাধারী সেই কোনকাল থেকে অফিসেই ফ্যামিলি নিয়ে রাত্রি যাপন করে—তা বন্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। জটাধারী আমার কাছে এসে কাঁদ কাঁদ হয়ে পড়লো। বললো, "আমি বাবু কোথায় যাবো? আমি মেমসায়েবকে ছাড়বো না।"

আমি দুঃখ করে উত্তর দিলাম, "পরাধীন দেশে জন্মেছিস—সাহেবদের অত্যাচার তো সহ্য করতেই হবে জটা, আমরা কী করতে পারি বল?"

"জটা অশিক্ষিত ঝাড়ুদার হলে কী হবে, ইন্ডিয়ার কমনম্যানদের মতো কমনসেন্স খুব স্ট্রং।" সে বললো, 'মাসের শেষ তাই! যদি দেড় টাকা হাতে থাকতো তা হলে এখনই মেমসায়েবকে মজা দেখিয়ে ছাড়তাম।'

"আমার গা শির-শির করে উঠলো। হাজার হোক ছোটলোক। রাগলে ওদের মাথার ঠিক থাকে না। আর তখনকার দিনে দেড় টাকার অনেক দাম--ওই টাকায় ইজিলি গুন্ডা লাগিয়ে খুন-খারাপী করিয়ে দেওয়া যায়।"

"আমি খুব সাবধানে ওর মনের ফন্দিটা জেনে নেবার জন্যে বললুম, দেড় টাকা অনেক টাকা। টাকাটা পেলে তুই কী করতিস?"

"জটা বললো, 'বউবাজারের ক্ষ্যান্তমণি ডাইনিকে দিয়ে ইস্পেশাল জল পড়িয়ে আনতাম। ওই জল ছিটিয়ে দিলেই সায়েবের ওপর বশীকরণ কেটে যাবে—কামবেল মেমসাব তো মন্তর দিয়ে রেমিংটন সায়েবকে ভেড়া

বানিয়ে রেখেছে'।"

"আমার অবস্থাটা বোঝো। সমস্ত গা ঘামছে। বিপ্লবে অর্থ সাহায্য করাটা বিপ্লবে অংশ নেওয়ার মতোই সিরিয়াস অপরাধ। তখন অফিসে ছুটি হয়ে গিয়েছে। আমি বসে বসে ওভারটাইম করছি। তখনকার ওভারটাইম মানে, নো মানি—ওনলি বেগার খাটা। ভাবতে ভাবতে বেশ নার্ভাস হয়ে গেলাম—আর নার্ভাস হলেই আমাকে বাথরুমে ছুটতে হয়। ওখানে শরীরটাকে শান্ত করে হঠাৎ মাথায় আইডিয়া খেলে গেলো। প্রথমে ভাবছিলাম, জটাধারীকে যদি আমি দেড় টাকা দিই, তা হলে প্রমাণ থেকে যায়। গড ফরবিড, জটাধারী নিজেই আমাকে পরে ব্ল্যাকলেবেল করতে পারে।"

"ব্ল্যাকলেবেল না ব্ল্যাকমেল," ইংরিজিতে হাফ-অনার্স অধীর চ্যাটার্জি আবার বলে উঠলো।

"ওই হলো—ব্ল্যাকলেবেল আর ব্ল্যাকমেল, নাইনটিন আর টোয়েন্টি, তোমরা যাকে উনিশ-বিশ বলো," জগদীশবাবু আবার স্মৃতিচারণে ডুবে গেলেন।

চোখের চশমাটা ময়লা রুমালে মুছতে মুছতে জগদীশবাবু বললেন, "বাথরুমেই অনেক বড় বড় আইডিয়ার জন্ম হয়—হিস্ট্রিতে পড়ে থাকবে বোধহয়। আমার মাথাতেও আইডিয়া খেলে গেলো। হাত ধোবার বেসিনের কাছে তিনটে আধুলি রেখে আমি শান্তভাবে বেরিয়ে এলাম। জটাধারী তখনও আমার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললাম, জটা বেসিনের কাছে কী যেন পড়ে আছে মনে হলো।"

"জটা ছুটে বাথরুমে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এলো। ওর চোখ দেখেই বুঝলাম, ও সব বুঝেছে। কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো ছলছলই করছে। জটা কোনোরকমে বললো, 'বাবু'।"

"আমি নিজের উত্তেজনা চেপে রেখে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, পোয়েট টেগোর, যাঁকে ইংরেজ সরকার স্যার উপাধি দিয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলেছেন—অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহ্য করে দুই পার্টিই ইকোয়াল খচ্চর।"

"ইস জগদীশদা বিপ্লবের নামে অত বড় পোয়েটের নামে আপনি কী সব অশ্লীল কোটেশন চালিয়ে দিলেন? আমি তো টেগোরের ওই ভার্সটা আমার মেয়ের মুখে বহুবার শুনেছি—ভাগওয়ান তুমি ইউগে ইউগে দুট পাঠায়েছো....." নটরাজন অনেকদিন কলকাতায় থেকে রবীন্দ্রভক্ত হয়ে পড়েছে।

"কবিতাটা আমারও মুখস্থ ছিল নটু," প্রতিবাদ করলেন জগদীশবাবু। "কিন্তু কমন পিপলকে বোঝাবার জন্যে অনেক সময় ভাল ভাল কোটেশনের স্লাইট অ্যাডিশন-অলটারেশন করতে হয়। দ্যাখো না অফিসের কোটেশনে লেখা থাকে—'ইঅ্যান্ড ও ই'—পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন মার্জনীয়।"

তর্কে সময় নষ্ট না-করে জগদীশবাবু বললেন, "টু কাট এ সর্ট স্টোরি লং—জটাধারী আমার নীরব ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তখনই বউবাজারে ক্ষ্যান্তমণি ডাইনির কাছে চলে গিয়েছিল। এবং পরের দিন সকালে কেউ আসবার আগেই রেমিংটন সায়েব ও মিসেস ক্যাম্পবেলের চেয়ারে ওই মন্ত্রপড়া জল ছড়িয়ে দিয়েছিল।"

"তারপর?" সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

"তারপর মন্ত্রের মতো কাজ হয়েছিল—রেমিংটন মেমসায়েব হঠাৎ একদিন ছুটির দিনে সায়েবকে অফিস থেকে তুলে নিতে এসে স্বামী এবং মেয়ে-অফিসারকে এমন কনসপায়ারিং পোজিশনে আবিষ্কার করলেন....."

ইংলিশে হাফ-অনার্স চ্যাটার্জি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "কমপ্রোমাইজিং পোজিশন বলছেন?"

একগাল হেসে জগদীশবাবু বললেন, "মোটেই না। অনেক ভেবে-চিন্তেই ওই কনসপায়ারিং কথাটা ব্যবহার করেছি—বাংলা করলে দাঁড়াবে ষড়যন্ত্রমূলক আসন। ছুটির দিনে কাজের ছুতোয় অফিসে এসে তুমি যদি পোড়াহাঁড়ির মতো কুচ্ছিৎ সেক্রেটারির সঙ্গে এক চেয়ারে বসে থাকো, তা হলে তোমার পুওর স্ত্রীর পক্ষে সেটা ষড়যন্ত্রমূলক আসন নয়—অক্সফোর্ড কেমব্রিজ কোন ডিক্সনারিতে এটা বলছে না?"

একটু শান্ত হয়ে জগদীশবাবু বললেন, "তোমরা ইংরিজির কচকচি নিয়ে সেকেলে সংস্কৃত পণ্ডিতদের মতো কূটতর্ক করো—কিন্তু সেদিন মিস কে, ওরফে ক্ষ্যান্তমণি ডাইনির জলপড়ায় হাতে হাতে ফল পাওয়া গেলো। সায়েবকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে মিসেস রেমিংটন বাড়ি নিয়ে গেলেন। ওই মাগী অফিসার মিসেস ক্যাম্পবেলের চাকরি পরের দিনই নট হয়ে গেলো। তার জায়গায় রেমিংটন সায়েবের অ্যাসিসটেন্ট হয়ে এলো এক গুঁফো ইন্ডিয়ান খ্রীস্টান ছোকরা। শোনা যায় রেমিংটন মেমসায়েব নিজে তার ইনটারভিউ নিয়েছিলেন।

"সেই যে এই আপিস থেকে মেয়ে-অফিসারের পাট চুকলো, তারপর অনেকদিন কেউ আর এখানে লেডি ঢোকাবার কথা পর্যন্ত তোলেনি। স্বাধীনতার পর নিচু পোস্টে বুড়ী মেমসায়েব টাইপিস্ট একজন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কমবয়সী মেয়ে-অফিসার নৈব নৈব চ। তবে এখন আবার নতুন রাজত্ব, দ্যাখো কী হয়।"

এসব আলোচনা গতকালের। গুজব রটবার বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে গুজব সত্য প্রমাণিত হবে এবং নায়িকা স্বয়ং মঞ্চে আবির্ভূতা হবেন, একথা অফিস মহলে কেউ কল্পনা করেনি।

হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান সুদর্শন চৌধুরী কাজ-পাগলা মানুষ। অফিস শুরু হবার কথা সাড়ে ন'টায়, কিন্তু তিনি ন'টা বাজবার আগেই অফিসে হাজির হন। চৌধুরী লাঞ্চে বেরোন একটা বেজে পাঁচ মিনিটে, ফেরেন দুটো বাজতে পাঁচ মিনিটে। এই পঞ্চাশ মিনিটে তিনি কেমন করে ডালহৌসির ট্রাফিকের জটাজাল ছাড়িয়ে লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে যান এবং লাঞ্চ সেরে আবার অফিসে ফেরেন তা একমাত্র ভগবান জানেন। টেলিফোন অপারেটর অর্ধেন্দু দত্ত বলে, "সায়েব এক একদিন অর্ধেক খেয়েই উঠে পড়েন। মিসেস চৌধুরী রেগেমেগে পরে ফোন করেন, তুমি অফিসে ফিরতে দশ মিনিট দেরি করলে মহাভারতের কোনো অসুবিধে হতো না।"

মিস্টার সুদর্শন চৌধুরী তখন শান্তভাবে বলেন, "বুলা, আমার অবস্থাটা বোঝো। এই কোম্পানিতে কোনো অফিসার পৌনে তিনটের

আগে লাঞ্চ থেকে ফেরেন না। সেইটে বন্ধ করবার জন্যে আমি চেষ্টা করছি—এই সময় নিজে দেরি করলে কীরকম দেখায় বলো?”

“মার্চেন্ট আপিসে চাকরি নেওয়া তোমার ঠিক হয়নি। দাদামশায়ের মতো ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হলে ভাল করতে।” ভর্ৎসনা করলেন মিসেস মৃদুলা চৌধুরী।

আজও ন'টা পনেরো মিনিটের সময় সুদর্শন চৌধুরী অফিসে কাজে বসেছেন। সাড়ে ন'টা বাজার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে তিনি পারমিতার স্লিপ পেলেন। টেবিলের কাগজপত্র সরিয়ে রেখে সুদর্শন চৌধুরী এবার পারমিতাকে ভিতরে আসতে বললেন।

নমস্কার নিয়ে এবং প্রতি নমস্কার জানিয়ে সুদর্শন বললেন, “ওয়েলকাম টু দি ওয়ার্লড অফ হ্যারিংটন ইন্ডিয়া লিমিটেড।” অত্যন্ত আন্তরিকতা ও স্নেহের সঙ্গে পারমিতাকে অভ্যর্থনা করলেন সুদর্শন।

চাকরিতে যোগ দেওয়া সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার পরে সুদর্শন এবার কোম্পানির ইতিহাস সম্পর্কে কথা শুরু করলেন। সুদর্শন বললেন, “হ্যারিংটন ইন্ডিয়া বেশ পুরনো কোম্পানি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক সেই বছর ওল্ড মিস্টার হ্যারিংটন কলকাতায় এই কারবারের পত্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ সেই বছর প্রকাশিত হচ্ছে—তাঁর বয়স তখন ছত্রিশ। বিশ্ববিজয় করে স্বামী বিবেকানন্দ তখন সবেমাত্র কলকাতায় ফিরেছেন।”

একটু অবাক লাগলো পারমিতার। তার ধারণা ছিল মার্চেন্ট অফিসের সায়েবরা সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির তেমন ধার ধারেন না। সুদর্শন চৌধুরী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, “এসব কথা বলছি এই জন্যে যে আপনারা নতুন জেনারেশনের এগজিকিউটিভ—আপনারা এই সব বন্ধ প্রাচীন অফিসে নতুন হাওয়া বইয়ে দেবেন, এই আমার প্রত্যাশা।”

চুপ করে রইলো পারমিতা। সুদর্শন বললেন, “আপাতত আপনার পোস্টের নাম হচ্ছে—স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট টু চেয়ারম্যান। প্রত্যেক পোস্টের একটা সংক্ষিপ্ত নামকরণের রেওয়াজ এই অফিসে বহুকাল ধরে চলে আসছে—তাই আপনারটা দাঁড়াচ্ছে SAC। এই অফিসে আমিও

বেশি পুরনো নই—এক বছর কয়েকমাস আগে চেয়ারম্যান হয়ে এসেছি। এই অফিস সম্বন্ধে অনেক রিপোর্ট এক সময় খবরের কাগজে বেরিয়েছে—অনেক জলঘোলা হয়েছে। সেসব এক সময় আপনাকে বলবো, আপনার জেনে রাখা প্রয়োজন হবে। আজ আমার একটা জরুরী লম্বা মিটিং রয়েছে স্টেট ব্যাংকের অফিসে। আমি মিস্টার ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—উনি আপনাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তারপর কাল সকালে আপনার সঙ্গে আমি আবার কথাবার্তা বলবো।"

সুদর্শন চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। মৃদু হেসে বললেন, "বাই-দি-বাই, এটা আমার আগে খেয়াল হয়নি, এই কোম্পানিতে আপনিই হবেন একমাত্র মহিলা অফিসার। যে দেশে মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সেখানে মার্চেন্ট অফিসে মহিলা অফিসার এমন একটা কিছু ব্যাপারই নয়। তাছাড়া মিসেস গান্ধী একবার যা বলেছিলেন—প্রাইম মিনিস্টারের কোনো সেক্স নেই। তিনি পুরুষ না মহিলা সেটা মোটেই ইমপর্টান্ট কথা নয়। অফিসারও তেমনি অফিসার—তিনি পুরুষ না মহিলা তাতে কিছুই এসে যায় না।"

ঘর থেকে বেরুবার আগে সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "আপনাকে বলা হয়নি, ভেঙ্কটরমণ ইজ আওয়ার ডেপুটি চেয়ারমান অফ দি বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট। অনেকদিন এই কোম্পানিতে কাজ করছেন।"

চেয়ারম্যানকে দেখেই ডেপুটি চেয়ারম্যান ভেঙ্কটরমণ চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। চেয়ারম্যান বললেন, "মিট মিস পারমিতা মুখার্জি। আজ থেকে উনি জয়েন করছেন। এঁর কথাই গত মাসে তোমাকে বলেছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ," মুখে খুব আন্তরিকতা দেখালেও মিস্টার ভেঙ্কটরমণ বেশি উৎসাহ প্রকাশ করতে পারলেন না। কারণ এই প্রথম হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে মিস্টার ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে পরামর্শ করা হলো না, চেয়ারম্যান নিজেই নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং দায়িত্ব নিয়েই এই বিপদ বাধালেন, একজন মহিলাকে হাজির করলেন হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার রঙ্গমঞ্চে।

চেয়ারম্যান বললেন, "ব্যাংকের সঙ্গে রিভিউ মিটিং রয়েছে, আমি ট্রেজারারকে নিয়ে বেরোচ্ছি।"

চেয়ারম্যানকে বিদায় জানিয়ে মিস্টার ভেঙ্কটরমণ এবার বেল টিপলেন। বেয়ারা আসতে পারমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী পছন্দ করেন—মিস মুখার্জি, টি অর কফি?"

কফি পছন্দ শুনেই ভেঙ্কটরমণ আন্দাজ করলেন নতুন অফিসারটি নিশ্চয় ইনটেলিজেন্ট। কিন্তু হেসে বললেন, "যদিও আমি সাউথ ইন্ডিয়ান, আই অ্যাম মোর দ্যান এ লোক্যাল ম্যান। আমি সব সময় চা খাই। আমার ওয়াইফের ফেভারিট হলো রাসুগোল্লা।"

মিষ্টি হাসলো পারমিতা। ভেঙ্কটরমণ এবার খুঁটিয়ে দেখলো পারমিতাকে। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় একটু দীর্ঘাঙ্গিনী—পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি মতো হবে। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফর্সা নয়—তবে শ্যামলীও বলা চলে না। হাল্কা চেহারা—এই আজকালকার মেয়েদের মুশকিল, কিছুতেই মোটা হতে চায় না। অথচ ট্রাডিশনাল ইন্ডিয়ান ধারণা অ্যাবাউট বিউটী হলো, দেহে কিছুটা স্নেহজাত পদার্থ থাকবে। দশটি মেয়ের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসবার মতো কোনো দৈহিক স্বাতন্ত্র্য পারমিতার মধ্যে নজরে পড়লো না। একটা দামী বাংলা তাঁতের শাড়ি পরেছে পারমিতা—তাতে ছোট ছোট ফুল তোলা। চোখ দুটো টানা টানা—সত্যি পদ্মলোচনা। বাঙালী মেয়েদের চোখ ভেঙ্কটরমণকে অবাক করে দেয়। এদেশে পদ্মের ছড়াছড়ি—তাই পদ্মের কোনো দাম নেই, কেউ চোখ নিয়ে মাথা ঘামায় না। পারমিতার হাতে একটা কালো চশমা—স্টাইলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চশমার কাঁচগুলো ঢাউস সাইজের ; প্রায় সমস্ত মুখখানা ঢেকে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট। এই বিরাট চশমা চেয়ারম্যানের ওয়াইফও পরে থাকেন। সেবার রসিকতা করে ভেঙ্কটরমণ মিসেস চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "চোখ ছাড়াও সমস্ত মুখে ধুলো পড়ে যাতে মেক-আপ নষ্ট না হয়, তার জন্যেই কাঁচের সাইজ বাড়ছে।" মিসেস চৌধুরী বলেছিলেন, "আপনাদেরই সুবিধে হলো—আমরা কালো কাঁচের ব্যাকডোর দিয়ে বোরখা-ঘোমটার যুগে ফিরে যাচ্ছি!"

ভেঙ্কটরমণ কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে পারমিতাকে বললেন, "আই অ্যাম গ্ল্যাড, আমরা একজন লোক্যাল পার্সনকে চাকরি দিতে পেরেছি।"

পারমিতা শান্তভাবে বললো, "স্ট্রিক্টলি স্পিকিং, আমি লোক্যাল গার্ল নই। জন্ম ইউ পি-তে, লেখাপড়া বিহারের শীতলপুর টাউনে। কলকাতার কিছুই চিনি না এখনও।"

ভেঙ্কটরমণ বললেন, "আমি বাঙালী কালচারের গ্রেট অ্যাডমায়ারার। যেখানেই বাঙালী থাকুন, তিনি যদি কখনও বাংলার মাটিতে পা না-ফেলেও থাকেন, তবু কলকাতা তাঁর হোম সিটি। এই শহরে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না—আটচল্লিশ ঘণ্টায় তুমি কলকাতার সঙ্গে আইডেনটিফায়েড হয়ে যাবে।"

ডেপুটি চেয়ারমান এবার পার্সোনেল অফিসার দেসাকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন. "মিস মুখার্জির বসবার কী ব্যবস্থা হয়েছে?"

দেসা এ-ব্যাপারে চেয়ারম্যানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলাপ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী ঘর ঠিক করে রেখেছেন। নীলমণি এতোক্ষণে সেখানে পিতলের নেমপ্লেটও লাগিয়ে দিয়েছে।

পারমিতার ঘরটাই প্রথমে দেখলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান। সঙ্গে মিস্টার দেসাও ছিলেন। ভেঙ্কটরমণ বললেন, "আপনার ঘর বা স্টেশনারি সংক্রান্ত কোনো অসুবিধা হলে মিস্টার দেসাকে বলবেন। ওঁর ইন্টারন্যাল টেলিফোন নম্বর লিস্টে পাবেন।"

ওখান থেকে বেরিয়ে ডেপুটি চেয়ারম্যান যখন পারমিতাকে বিভিন্ন অফিসারের ঘরে নিয়ে যেতে লাগলেন, তখন হ্যারিংটন ইন্ডিয়া অফিসের সর্বস্তরে রীতিমত চাপা চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। ইনভয়েস টাইপ করা বন্ধ রেখে পাণ্ডবেশ্বরবাবুও দূর থেকে নতুন মেয়ে-অফিসারটিকে দেখলেন। নতুন অফিসার হল্ ঘরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় পাণ্ডবেশ্বরবাবুর কাছাকাছি আসতে তিনি ইচ্ছে করেই কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। তার মিনিট পাঁচেক পরে টয়লেটের কাজ শেষ করতে করতে বললেন, "ভীষণ গম্ভীর. মনে হলো। একেবারে ডাইরেক্ট অফিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো—একটু এয়ার নিয়ে চলবেই তো।"

বাবুদের টয়লেটে যতখানি ঔৎসুক্য, তার থেকে বেশি চাঞ্চল্য অফিসারদের কাঁচের ঘরে। সেখানকার অধীশ্বররাও খবরটা আগে পাননি। ডেপুটি অ্যাকাউনটেন্ট ধরণী সেন ইন্টারন্যাল ফোনে মিস্টার দাশগুপ্তকে কল করলেন। কোনোরকম রেফারেন্স না দিয়ে শুধু চাঁচাছোলা প্রশ্ন করলেন, "আলাপ হয়েছে?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে ডি-সি ছিলেন।" ওপার থেকে দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন। "কী বুঝেছো?"

"বুঝবে তো তুমি। তুমিই তো এইমাত্র চোখের দেখা দেখলে", ধরণী সেন উল্টো চাপ দিলেন।

দাশগুপ্ত দুশ্চিন্তা চাপতে পারলেন না। দুখানা ফাইল নিয়ে ছুতো করে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, সেক্রেটারিকে বললেন, "আমি মিঃ সেনের সঙ্গে ডিসকাশনের জন্যে যাচ্ছি। কেউ খোঁজ করলে ওখানে খবর দেবেন।"

ফাইলটা নিয়ে সেনের ঘরে ঢুকে দাশগুপ্ত বললেন, "তোমার অপারেটরকে একটু বলে দাও না ভাই—আমি এখানে আছি, কোনো আউট সাইড কল এলে...."

"কল এসে ফিরে যাক না। কোনো পরিচিতা সুন্দরী মহিলা-টহিলা টেলিফোন নম্বর নেন নি তো?" সেন রসিকতা করলেন।

"ছাঁদনাতলার পরিচিতা মহিলাটিকেই সামলাতে পারছি না। তার ওপর চাকরি-বাকরির যা অবস্থা। জানো তো হ্যারিংটন ইন্ডিয়ায় কাজ করে শুনলে এখন আর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে না।"

"কী সব বাজে বকছো? আমরাও তো হ্যারিংটনে কাজ করছি—আমাদের কী বিয়ে হয়নি?"

দাশগুপ্ত বললেন, "সে তো আট বছর আগেকার কথা। গত কয়েক বছরে অনেক জল গড়িয়েছে। তোমায় সত্যি করে বলছি, আমার জানা-শোনা এক ভদ্রলোক, মেয়ের বিয়ের জন্যে তোমার অফিসেরই এক পাত্রের সঙ্গে এগোচ্ছিলেন। লাস্ট মোমেন্টে পিছিয়ে গেলেন—ওঁর শ্যালক, বড় জামাই, সবাই বললে, হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার অবস্থা ভাল নয়। কখন

কী হয় কে জানে।"

সেন গম্ভীরভাবে বললেন, "সবই সম্ভব। আমরা অফিসের মধ্যে বসে থাকি, বাইরে কী হচ্ছে, সব খবর তো রাখি না।"

দাশগুপ্ত বললেন, "পাত্রীর বাবা হ্যাপনস্ টু বি এ দূর সম্পর্কের আত্মীয় অফ গিন্নী। আমি দোষের মধ্যে রেগেমেগে বলেছি, ইওর মেসো খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেননি। এতে বৃন্দা গেলো চটে আমার ওপর। বললো, "ঠিকই করেছেন মেসো। তোমাদের কোম্পানির এমন অবস্থা হবে জানলে, আমার বাবাও আট বছর আগে একই ডিসিশন নিতেন।"

সেন বললেন, "রেগে লাভ নেই, ব্রাদার। কোম্পানির খেয়া-নৌকাতেই তো আমরা সংসারসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি। সেখানে গোলমাল হলে একটু বদনাম তো হবেই। আমাদের একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো পথ নেই।"

দাশগুপ্ত বললেন, "যা হোক, আজকের ব্যাপারটা কী? হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, বিনা মেঘে বজ্রপাত? কবে তোমরা মহিলাকে নেবার ডিসিশন নিলে?"

"কেন লজ্জা দিচ্ছ? হাইয়েস্ট লেভেলে এই সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি আমরা দিই? এসব এখন সমস্ত চেয়ারম্যানের হাতে।"

"কিন্তু ইনটারভিউ যখন হয়েছে, তখন নিশ্চয় জানতে। বেমালুম খবরটার কথা চেপে যাচ্ছো।"

সেন বললেন, "বিজ্ঞাপনটা অ্যাডভারটাইজিং ডিপার্টমেন্ট দিয়ে যায় নি—গিয়েছিল খোদ চেয়ারম্যানের অফিস থেকে সোজা স্টেটসম্যান অফিসে, আন্ডার এ বক্স নম্বর। ইনটারভিউয়ের চিঠি পাঠানো হয়েছিল কোম্পানির নতুন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ফক্স এন্ড অ্যাসোসিয়েটেসের অফিস থেকে। ইনটারভিউ হয়েছিল কলকাতার নাম-করা কোনো হোটেলে—অন্তত আমার কাছে তাই খবর। তারপর তো বুঝতেই পারছো—আজ নিজের চোখেই দেখলে।"

দাশগুপ্ত বললেন, "আই ওনলি হোপ ইট ইজ এজ ইজি এজ দ্যাট।"

বন্ধুর কথায় একটু প্যাঁচ আছে সন্দেহ করে সেন সায়েব জানতে

চাইলেন, "অন্য কোনো ভাষ্য আছে নাকি?"

"যা দিনকাল, কখন কী ঘটে? আমরা তো চুনোপুঁটি—নিজের জানটুকু বাঁচলেই ধন্য হয়ে যাই।"

সেন সায়েব আরও চেপে ধরতে দাশগুপ্ত বললেন, "অল আই ক্যান সে, ওয়েট এন্ড সী—অপেক্ষা করো ও দ্যাখো, এবং অপেক্ষা করবার সময় মনে রেখো দেওয়ালেরও কান আছে।"

বন্ধুকে সেন আর ঘাঁটালেন না—শুধু আন্দাজ করলেন মিস পি মুখার্জির আকস্মিক এই অফিসে উড়ে এসে জুড়ে বসার পিছনে অনেক নাটকীয়তা থাকতে পারে।

লাঞ্চ টাইমে ডেপুটি চেয়ারম্যান ভেঙ্কটরমণ বাড়ি ফিরলেন একটু বিরক্তভাবে। ওঁর চিন্তান্বিত মুখ দেখেই গৃহিণী গায়ত্রী সন্দেহ করলেন অফিসে কিছু ঘটেছে। গলফের ব্যাপারেও স্বামীর সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল। বিবাহিত জীবনের প্রথম পনেরো বছর রান্না-বান্না নিয়েই কাটিয়েছেন গায়ত্রী দেবী। চিরন্তন দক্ষিণী প্রথায় অন্ধকার থাকতে উঠে সংসারের খুঁটিনাটি এবং পূজাপার্বণ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন গায়ত্রী দেবী।

তারপর স্বামী আচমকা প্রমোশন পেতেই বিপদ বাধলো। সাউথ ইন্ডিয়ান অফিসারদের স্ত্রীরা নর্থ ইন্ডিয়ান অফিসারদের স্ত্রীর মতো স্মার্ট এবং মিশুকে নয়—এমন একটা অভিযোগ কোম্পানির তখনকার এম-ডি একদিন ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছিলেন। বড়সায়েব যদিও তখন মত্ত অবস্থায় ছিলেন, তবু ভেঙ্কটরমণ কথাটার ওপর যথোচিত গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মিণী গায়ত্রী দেবীর জীবনযাত্রায় পরের দিন থেকে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে গায়ত্রী দেবীকে গোবিন্দপুর লেডিজ গল্‌ফ ক্লাবেও প্রতিদিন অপরাহ্নে

দেখা যেতে আরম্ভ করেছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্ত্রী স্বয়ং গায়ত্রীর মেম্বারশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রপোজ করেছিলেন। শাড়ী এবং ব্লাউজ ছেড়ে—টাইট প্যান্ট এবং ছেলেদের হাফ শার্ট পরা গৃহিণীকে প্রথম দেখে ভেঙ্কটরমণও বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। নবকলেবরে স্বামীর সামনে ঈষৎ অস্বস্তিতে পড়লেও গায়ত্রী দেবী বাহিরবিশ্বে নিঃশঙ্কচিত্তে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

নিতান্ত গোঁয়ের মাথায় মাত্র এক বছরের মধ্যেই গায়ত্রী দেবী গল্‌ফের জটিল ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন এবং বড় সায়েবের গৃহিণীকে গোবিন্দপুর মহিলা গল্‌ফ ক্লাবের নানা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছিলেন। তখন দিনে দু-তিনবার বড় সায়েবগৃহিণী ফোনে মিসেস ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে গল্‌ফ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করতেন এবং স্ত্রীর 'অলৌকিক' কাণ্ডকারখানার জন্যে স্বামী সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

নতুন এম-ডি যে মাত্র দেড় বছরের মধ্যে কোম্পানি থেকে বিদায় নেবেন একথা যদি ঘুণাক্ষরেও গায়ত্রী দেবী জানতে পারতেন তা হলে এইসব ফ্যাসাদে তিনি অবশ্যই জড়িয়ে পড়তেন না। কোথায় কিপিং সায়েবের বউ আগাথা আর কোথায় সুদর্শন চৌধুরীর স্ত্রী বুলা। বুলা চৌধুরীর গল্‌ফে একটুও আগ্রহ নেই। গায়ত্রী ভেঙ্কটরমণ বেশ ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন। গল্‌ফের পিছনে আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না—কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি মহিলা গল্‌ফ ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলে সমাজে হাসাহাসি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাপারটা লোকের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারে।

লাঞ্চ টেবিলে স্বামীর সঙ্গে খেতে বসে গায়ত্রী দেবী বললেন, "তুমি যে কিছুই খাচ্ছো না? তুমি আর একটা ইডলি নাও....কাগজে দেখেছো তো ইউনাইটেড নেশনস্ পর্যন্ত বলছে পাইপিং হট ইডলি ইজ গুড ফর হেলথ।"

ভেঙ্কটরমণ বললেন, "তোমার তো আজ খেলার ডেট? কার সঙ্গে খেলছো?"

বিরক্তিভরে মুখ বিকৃত করলেন গৃহিণী। "আর বোলো না—ফার্স্ট শিকাগো ব্যাংকের ম্যানেজারের বউ জোন হেওয়ার্ডের সঙ্গে। স্রেফ সময়ের অপচয়।"

ভেঙ্কটরমণ জানেন খেলার সাথী হিসেবে কাকে পেলে গৃহিণী খুশী হতেন। তিনি স্টেট ব্যাংকের ট্রেজারার মিঃ খান্নার গৃহিণী। স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে মিঃ ভেঙ্কটরমণ সম্প্রতি বেশ ব্যগ্র হয়ে আছেন।

গায়ত্রী বললেন, "ভাবছি আজ আর বেরুবো না—স্রেফ ফোনে বলে দিই শরীরটা সুস্থ মনে হচ্ছে না।"

"গত সপ্তাহে দুবার গল্‌ফ খেলার ব্যাপারে লাস্ট মোমেন্টে তোমার সো-কল্‌ড 'শরীর খারাপ' করেছে, ডার্লিং"—ভেঙ্কটরমণ গৃহিণীকে মনে করিয়ে দিলেন।

গায়ত্রী বাধ্য হয়ে ময়দানে না-যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। বিকেলে আবার মিউজিক সার্কেলের কমিটি মিটিং রয়েছে। সেখানে গায়ত্রীর না গিয়ে উপায় নেই—কারণ স্বয়ং চেয়ারম্যানের স্ত্রী মিসেস চৌধুরী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে উৎসাহী। বুলা চৌধুরীর কথা মনে রেখেই গায়ত্রী নিজেই এই গানের প্রতিষ্ঠানে ঢুকেছেন।

গায়ত্রী বললেন, "সাড়ে পাঁচটার সময় হার-হাইনেসের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কোনো খোঁজখবর নেবার আছে নাকি?"

গায়ত্রী দেবী অনেক সময় স্বামীর ইনটেলিজেন্স অফিসারের কাজ করেন। অনেক গুরুতর ঘটনার পূর্বাভাষ গায়ত্রীই প্রথম স্বামীর কাছে দিয়েছেন। ভেঙ্কটরমণ বললেন, "আর খবর। কাস্টডিয়ান এবার জবর চাল দিয়েছেন। কোথা থেকে এক ইয়ং মহিলাকে এগজিকিউটিভ র‍্যাংকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। সমস্ত সিলেকশনের ব্যাপারটা গোপনে হয়েছে। অফিসের কেউ, এমনকি আমিও জানতে পারিনি।"

মিষ্টি হেসে মিসেস ভেঙ্কটরমণ বললেন, "খোঁজ নিয়ে দেখো—নিশ্চয় কোনো ডিসট্যান্ট রিলেটিভ। নিজের লোক ঢোকাবার চান্স পেলে কে ছাড়ে? তোমার হাতে যখন ক্ষমতা ছিল, তখন তো দেশের কত লোককে

তুমি ঢুকিয়েছো। ক্যালকাটা ফ্যাকটরিতে শেষ পর্যন্ত একটা ম্যাড্রাস কাফে খুলতে হয়েছে।"

ভেঙ্কটরমণ মাথা নাড়লেন। পারমিতা মুখার্জী যদি মিস্টার সুদর্শন চৌধুরীর আপন লোক হতো, তা হলে ভেঙ্কটরমণ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতো। কিন্তু সুদর্শন চৌধুরী যে প্রকৃতির লোক, তাতে কোম্পানির বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের কোনো লোককে ঢোকাবেন মনে হয় না। ইন ফ্যাক্ট সুদর্শন চৌধুরী ইতিমধ্যেই ম্যানেজারদের কাছে নতুন সার্কুলার পাঠিয়ে এই কোম্পানিতে কার কতজন আত্মীয় কুটুম্ব কাজ করেন, তার লিস্টি চেয়ে পাঠিয়েছেন।

ভেঙ্কটরমণ এরপর স্ত্রীকে বললেন, "মিস পারমিতা মুখার্জীর আচমকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অত সহজ ব্যাপার নয়। এর মধ্যে আরও সীরিয়াস ব্যাপার আছে।"

"আর কী সীরিয়াস ব্যাপার থাকতে পারে?" গৃহিণী প্রশ্ন করলেন।

ভেঙ্কটরমণ এবার স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কী বললেন। সেই গোপন কথাগুলি শুনে গায়ত্রীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। স্বামীর বুদ্ধিতে বিস্মিত গায়ত্রী বললেন, "সত্যি তোমার ব্রেন বটে—সাধে কি আর তুমি সামান্য একটা স্টেনোগ্রাফারের পোস্টে জীবন শুরু করে এইখানে উঠেছো। তুমি যা বলছো, তা অবশ্যই হতে পারে। আমার তো মেয়েমানুষের মন। আমি অন্য সন্দেহ করছিলাম।"

ভেঙ্কটরমণ এবার স্ত্রীর গল্‌ফ সেট কাঁধে করে গাড়ির পিছনে রাখলেন। গৃহিণীকে ময়দান কোর্সে নামিয়ে দিয়ে সায়েবের গাড়ি ছুটলো বি-বি-ডি বাগের দিকে। ডেপুটি চেয়ারম্যান যাবার সময় গিন্নীকে বললেন, "পনেরো মিনিটের মধ্যে গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি অফিসের পুল কারে বাড়ি ফিরে আসবো—তুমি যতক্ষণ খুশী গাড়ি রেখে দাও।"

মিসেস ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে গোবিন্দপুর লেডিজ গল্‌ফ ক্লাবে প্রথম যার দেখা হলো, তার নাম বৃন্দা। সুজন দাশগুপ্তের স্ত্রীকে মিসেস

ভেঙ্কটরমণই উৎসাহ দিয়ে গল্‌ফ ক্লাবে ঢুকিয়েছিলেন—তিনি নিজেই গল্‌ফে ইস্তফা দিলে বৃন্দা কি করবে ভগবান জানেন।

দুটো হাল্‌কা চেয়ার নিয়ে লনে বসে গায়ত্রী বললেন, "কেমন আছো, বৃন্দা? বাড়ির খবরাখবর সব ভাল তো?"

সিগারেট প্যাকেটটা গায়ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বৃন্দা বললো, "এই অবস্থায় যতটা ভাল থাকা যায়—তার একটুও বেশি নয়। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে—তাতে মান-সম্মান দায়-দায়িত্ব বজায় রেখে সংসার চালেনোই দায় হয়ে উঠছে।"

মিসেস ভেঙ্কটরমণ দুটো জিনের অর্ডার দিলেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "গভরমেন্ট চায় না দেশে ইনডাস্ট্রি বাড়ুক। এদেশে স্পেকুলেটর ছাড়া কেউ সংসার চালাতে পারবে না। তোমার ঐ সিগারেটের দাম একশ টাকা প্যাকেট হলেও কিছু এসে যেতো না, যদি তোমার বর বড় কোম্পানিতে সো-কল্‌ড বড় চাকরি না করে নিজের বিজনেসের মালিক হতো এবং ব্ল্যাক মার্কেটে হাত পাকাতো।"

"চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁগুলো দেখেছেন?" প্রশ্ন করলো বৃন্দা।

"অবশ্যই দেখেছি। একদিন এগুলো ভদ্রলোকদের জন্য তৈরি হয়েছিল—এখন কালো টাকাওয়ালাদের ছেলেপুলে নাতি-নাতনীরা সমস্ত সীট বোঝাই করে রেখেছে। অফিসের কোনো গেস্ট না-থাকলে তোমার-আমার মতো লোকের ওখানে ঢোকার কথাই ওঠে না।"

বৃন্দা বললো, "অফিসেও কী যে হচ্ছে বুঝি না—সুজন সারাক্ষণ কী সব ভাবে!"

অফিসের কথা উঠতেই গায়ত্রী দেবীও সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন, "কী যে ওখানে হচ্ছে আমিও বুঝতেই পারি না। একদিন সোনার অফিস ছিল—ক্রমশ সব গেলো। এখন আরও খারাপ হতে চলেছে।"

জিনের গ্লাসটা টেবিলে রেখে বৃন্দা এবার মিসেস ভেঙ্কটরমণের দিকে ঝুঁকে পড়লো। গায়ত্রী দেবী বললেন, "অফিসে নতুন একটি মেয়ে-অফিসার এসেছেন আজ থেকে।"

গুজবটা বৃন্দা গতকালই স্বামীর মুখে শুনেছে। কিন্তু সেটা বেমালুম চেপে গিয়ে বললে, "ওমা! তাই নাকি? হাউ ইনটারেস্টিং।"

"মোটেও ইনটারেস্টিং না হতে পারে!" জিনের গেলাসটা আলতোভাবে ঠোঁটে ঠেকিয়ে গায়ত্রী বললো, "লাইমজুস কর্ডিয়াল ঠিক পরিমাণে পড়েনি—মামুদ, মামুদ।"

বৃন্দা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বেয়ারা মামুদ আসতেই বৃন্দা বললো, "তুমি তো জানো মামুদ, মেমসায়েব কতখানি লাইমজুস কর্ডিয়াল পছন্দ করেন।"

ক্ষমা প্রার্থনা করে মামুদ আবার লাইমজুস কর্ডিয়ালের বোতল আনতে ছুটলো। মিসেস ভেঙ্কটরমণ দু হাতের তালুতে গেলাশটা ঘষতে ঘষতে বললেন, "আমার এসব আলোচনায় থাকাই উচিত নয়—কিন্তু হু ইজ দিস গার্ল? শি ক্যান বি এনিথিং।"

তারপর ফিসফিস করে বৃন্দাকে নতুন সেই মেয়ে-অফিসার সম্বন্ধে গায়ত্রী দেবী কী সব বললেন। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন. কেউ যেন এসব কথা না জানতে পারে—নট্ ইভন সুজন।

গল্‌ফ খেলা মাথায় উঠলো বৃন্দার। কোনোরকমে একটু পাটিং প্র্যাক্‌টিস করে বৃন্দা ক্লাব হাউসে ফিরে এলো। স্বামীর অফিসে একটা জরুরী টেলিফোন করলো। সুজন ঘরে ছিল না, ওর সেক্রেটারি বললো, খুব সম্ভব নতুন মিস মুখার্জির সঙ্গে ডিসকাশন করছেন। বৃন্দা মেসেজ রাখলো, স্বামী যেন আজ সোজা বাড়ি ফিরে আসেন, বেশি দেরি না করেন।

টেলিফোন নামিয়ে বৃন্দা আর একটা সিগারেট ধরালো। তারপর দেখলো, মিসেস ভেঙ্কটরমণ ফার্স্ট শিকাগো ব্যাংকের ম্যানেজারের তরুণী বউয়ের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত রয়েছেন। এতোদূর থেকে ওদের দুজনকে পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। আর একটা জিন দ্রুত গলায় ঢেলে দিয়ে বৃন্দা ক্লাব হাউস থেকে বেরিয়ে গাছের তলায় পার্ক করানো গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে বসলো এবং গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

যাকে নিয়ে সমস্ত অফিসে এবং অফিসারদের ঘরে ঘরে এতো কৌতূহল ও মাতামাতি সেই মেয়েটি এই মুহূর্তে নিজের অফিস ঘরে চুপচাপ বসে আছে। সামনে কয়েকটা ফাইল। টেবিলের বাঁদিকে তিনটে টেলিফোন—যার একটা ডাইরেক্ট লাইন। একটা বোতাম টিপে লাইনটা কাস্টডিয়ানের ঘরে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায়। আর একটা ইন্টারন্যাল টেলিফোন—ডায়াল করে অফিসের সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায়। আর একটা অফিসের পি-বি-এক্স-এর সঙ্গে যুক্ত।

ঘরটায় আলো যথেষ্ট। দেসা লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সাজানো গোছানো ঠিক আছে কিনা, না-হলে মিস মুখার্জির নির্দেশমতো পুনর্বিন্যাস সম্ভব। ছোটখাট একটু-আধটু পরিবর্তন করে নিয়েছে পারমিতা। দেসা সায়েবের সহকারী নীলমণি ঘরে ঢুকেই বুঝলো, নতুন মেমসায়েবের রুচি আছে।

নীলমণি আরও দেখলো, মেমসায়েব বেশ স্মার্ট। ভয়-ডর একটু কম হবে মনে হচ্ছে—কারণ প্রথম দিন অফিস করতে এসে সবাই সাধারণত একটু সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, কিন্তু মিস মুখার্জির মধ্যে কোনো সংকোচ নেই।

চেয়ারম্যান সাহেবের টাইপিস্ট এসে অনেকগুলো ফাইল বাঁ-দিকের ছোট্ট একটা স্টীল ক্যাবিনেটে পুরে ফেললো। মিসেস মানুক বললেন, "মিস্টার চৌধুরী এইসব ফাইলগুলোতে চোখ বুলিয়ে রাখতে বলেছেন, ফিরে এসে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন।"

অফিসের কিছু কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে পারমিতার। নতুন অফিসে প্রথম দিকে একটু একটু ভয় লাগবে, এমন একটা আন্দাজ বাবাও দিয়েছিলেন। কিন্তু পারমিতা মোটেই অস্বস্তি বোধ করছে না।

পারমিতার হাতের লেখা সুন্দর—গোটা মুক্তোর মতো লেখা বাবা

খুব যত্ন করে শিখিয়েছিলেন। ছোটবেলায় বাবা-মায়ের অবহেলাতেই ছেলেমেয়েদের হস্তলিপি খারাপ হয়ে যায়, বাবা বলতেন। এবং সেই জন্যে গোড়া থেকেই এক বন্ধু আর্টিস্টকে দিয়ে মেয়ের জন্যে আদর্শলিপির বই তৈরি করিয়েছিলেন বাবা। ফল ভালই হয়েছে—হাতের লেখার মাধ্যমে প্রথম কারুর সঙ্গে পরিচয় হলেই তিনি লেখিকা সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা করে বসেন। পরীক্ষাতেও খুব সুবিধে পেয়েছে পারমিতা—সুন্দর নির্ভুল হাতের লেখার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কাজ করেছে, তা আন্দাজ করতে পরীক্ষকের কখনও কষ্ট হয়নি।

এই হাতের লেখার জন্যে বাবার খুব গর্ব। মাকে বলেছে, "আর্টিস্ট রেখে লেখা শেখালেই লেখা ভাল হয় না। আজকাল সাইকোলজিস্টরা বলছে, লেখাটা হলো মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। মিতুর হাতের লেখা দেখলেই বোঝা যায়, ওর পার্সোনালিটি কী রকম।"

মা ওসব বিশ্বাস করতেন না। রেগেমেগে বলতেন, "তুমি মেয়েকে হাইকোর্টের জজ করবে বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকো। মেয়ে তোমায় রাজা করবে। হাতের লেখা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ও মুখে যে ভাবই দেখাক, মিতু আসলে ভীষণ ভীতু, বাইরে শুধু তোমার আস্কারা পেয়ে হুড়ুম-দুড়ুম করে বেড়ায়।"

এখন এই নতুন অফিসে প্রথম দিনের দায়িত্ব বুঝে নিতে বসে এসব কথা ভাববার সময় নয়। আরও গোটা কয়েক ফাইল দ্রুত পড়ে নিলো পারমিতা—তারপর নিজের ছোট্ট প্যাডে প্রত্যেকটা ফাইলের মূল বক্তব্যের ছোট ছোট সামারি নিজের হাতে লিখে ফেললো।

মিস্টার দেসা এক সময় স্টেনো-টাইপিস্ট অনাদিবাবুকে এনে হাজির করলেন। অনাদিবাবু এ-অফিসে অনেকদিন কাজ করছেন—রিটায়ারের বেশি বাকি নেই। দেসা বললেন, "অনাদি উইল বি অ্যান অ্যাসেট টু ইউ।"

শুধু পারমিতাকে ভদ্রলোক যা বললেন না, তা হলো, মেয়ে-অফিসারের ছেলে পি-এ খুঁজে বার করতে দেসাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। প্রথমে অধীর চ্যাটার্জিকে বাজিয়ে দেখেছিলেন দেসা—কিন্তু অধীর

চ্যাটার্জি হাতজোড় করে বলেছে, কোম্পানি তাকে অনেক ভাবেই তো বেইজ্জতি করছে, এখন আবার কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে কেন? মেয়েমানুষের কাছে কাজ করলে চাটুজ্যের সামাজিক সম্মান আর থাকবে না। লোকে ভাববে, পানিশমেন্ট হয়েছে। মিস্টার দেসা জোর করতে পারতেন, আফটার অল অফিসটা নিজের খেয়াল-খুশীর জায়গা নয়, যেখানে কাজ দেওয়া হবে, সেখানেই করতে হবে। কিন্তু অধীর চাটুজ্যে এখন ইউনিয়নে মাথা গলিয়েছে, তাকে বেশি ঘাঁটানো যুক্তিযুক্ত মনে করেননি সুচতুর দেসা সায়েব।

এরপরেও আরও কয়েকজনকে চেষ্টা করেছেন মিস্টার দেসা। কিন্তু সব ছেলেদেরই আঁতে ঘা লেগেছে যেন। নানা ছুতো দেখিয়ে তারা এক এক করে পিছলে বেরিয়ে গেছে। জগদীশবাবুর ভাবী জামাই কমলেশ্বরের নামও উঠেছিল। কিন্তু দেসার সহকারী নীলমণিবাবুকে হাতে পায়ে ধরে জগদীশবাবু কোনোরকমে কমলেশ্বরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অনাদিবাবুই ভরসা। অনাদিবাবু সেই খোদ ইংরেজ আমলের লোক। যুদ্ধের সময় উইমেনস্ অগজিলারি কোর-এ মেল টাইপিস্টের কাজ করেছেন। সুতরাং আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না!

অনাদিবাবুর দিকে একবার তাকালো পারমিতা। চোখে মোটা কাঁচের চশমা, চুল অর্ধেক-পাকা। ধবধবে শাদা শার্ট এবং ধুতি পরেছেন ভদ্রলোক। নমস্কার জানিয়ে, অনাদিবাবু বললেন, "আপনার দু নম্বর বোতাম টিপলেই, আমার চেয়ারের সামনে লাল আলো জ্বলে উঠবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবো।"

অনাদিবাবু যে রকম সম্ভ্রমের সঙ্গে নমস্কার করলেন, তাতেই পারমিতা বুঝলো, এই কোম্পানিতে অফিসারদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি আছে। পারমিতা যে কলেজে এতোদিন পড়াতো, সেখানে কোনোরকম প্রেস্টিজের বালাই ছিল না। বেয়ারাদের কেউ দিদিমণিদের কথাই শুনতে চাইতো না, হাজারবার বেল টিপলেও শ্রীমানদের দেখা পাওয়া যেতো না টীচার্স রুমে। আর কলেজের হেড ক্লার্ক মিশ্রজীর কথাই আলাদা—স্বয়ং ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল শুভ্রাদিও তাঁকে সমীহ করে চলতেন। কখনও ডেকে পাঠাবার

কথাই ভাবতে পারতেন না, কিছু দরকার হলে নিজেই মিশ্রজীর ঘরে গিয়ে কথা বলতেন। অর্ডিনারী লেকচারাররা তো মিশ্রজীর কাছে মাইনে-সংক্রান্ত কোনো খবর নেবার আগে খোঁজ করতো মিশ্রজীর মেজাজ কেমন আছে।

চোখের চশমাটা শ্যাময় লেদারে আর একবার ভাল করে মুছে নিলো পারমিতা। নতুন এই শহরে, নতুন পরিবেশে, নতুন এই জীবন মন্দ হবে না মনে হচ্ছে। স্রেফ মাস্টারি থেকে এখানে অনেক বেশি রোমাঞ্চ থাকবে মনে হচ্ছে।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পারমিতা এবার ছোট ডাইরি থেকে একটা নাম বার করলো। টেলিফোন তুলে নাম্বার চাইলো পারমিতা। রিসিভার নামাতে-না-নামাতেই কল এসে গেলো। ফোন তুলে পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "স্ত্রী শিক্ষাসদন? মে আই টক টু অণিমা চ্যাটার্জি?"

অণিমা চ্যাটার্জি ইতিহাসের লেকচারার। টীচার্স রুম থেকে বেরিয়ে এসে ফোন ধরতে তিন মিনিট লেগে গেলো। "হ্যালো, অণিমাদি? আমি পারমিতা মুখার্জি—আমার চিঠি পেয়েছিলে?"

"পারমিতা! অনেকক্ষণ টেলিফোন ধরে থাকতে হয়েছে তো?"

"না এমন কিছু নয়।" পারমিতা উত্তর দেয়।

অণিমাদি বললেন, "তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি কি হাওড়া স্টেশন থেকে কথা বলছো নাকি?"

"না অণিমাদি, আমি বি বি ডি বাগ থেকে কথা বলছি।"

"শোনো, চিন্তার কিছু নেই। ফরচুনেটলি তোমার থাকবার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আমার চিঠি পাওনি?"

"এখনও পাইনি—হয়তো আজ পৌঁছবে, বাবা নিশ্চয় চিঠি রিডাইরেক্ট করে দেবেন।"

"চিঠিপত্তরের যা ব্যাপার—আমি পাঁচদিন আগে উত্তর লিখেছি।" একটু থেমে অণিমাদি বললেন, "আমার আর একটা ক্লাস রয়েছে। তারপরেই অফ। আমি সোজা ফিরে যাবো লেডিজ হোস্টেলে। তুমিও

ওখানে চলে এসো মালপত্র নিয়ে। কোনো অসুবিধা হবে না। আমি মিসেস খান্নার সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। ইন ফ্যাক্ট, আমার চিন্তা হচ্ছিল, তোমার উত্তর আসছে না কেন? আগামীকালের পর আর জায়গাটা রাখতে পারতাম না।"

এরপর লেডিজ হোস্টেলে যাবার পথনির্দেশ দিলেন অণিমাদি। কিন্তু যেসব রাস্তার নাম করলেন, সেসব রাস্তা পারমিতার একেবারে অপরিচিত—বাঙালী হয়েও কলকাতার কিছু জানে না সে, ভাবতে বেশ লজ্জা লাগছে। তবে লজ্জার মাথা খেয়ে অণিমাদির কাছে রাস্তার বিস্তারিত আরও খবরাখবর নিলো পারমিতা। অণিমাদিও কিন্তু মেড-ইন-ক্যালকাটা গার্ল নন, চার বছর আগে তিনিই গাঁইয়ার মতো অন্য রাজ্য থেকে এই কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন।

পারমিতা বললো, "অফিসের পরে আমি কোনো এক সময় হাজির হচ্ছি। আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

"রাস্তার ডিরেকশন বুঝতে পারলে তো?" অণিমাদি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"ভয় নেই, হারিয়ে যাবো না," এই বলে পারমিতা এবার টেলিফোন নামিয়ে দিলো।

একটা চিন্তা কমলো তা হলে। গতরাত্রে মায়ের বান্ধবীদের বাড়িতে বাধ্য হয়ে পারমিতাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। ওদের আবার একটাও বাড়তি ঘর নেই। মাসীমা ও পারমিতাকে শোবার ঘরে জায়গা দিয়ে মেসোমশাই বাইরের ঘরে পল্টুর জায়গাটা দখল করলেন। পল্টু বেচারা রাত কাটালো বাইরের ঘরের মেঝেতে। পারমিতার একটু অস্বস্তি লেগেছিল। হাওড়া স্টেশনে নেমে প্রথমে ভেবেছিল কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবে। কিন্তু নিঃসঙ্গ মেয়ে একা একা কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবে, একথা এখনও এই সুসভ্য দেশের কোনো অভিভাবক কল্পনা করতে পারেন না। গণপরিষদে পাশ-করা সংবিধান অনুযায়ী মেয়েদের কতরকম স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশের মেয়েরা নাকি ভারতীয় মেয়েদের মতো এতো স্বাধীনতা ভোগ করে না। অথচ

বিরাট এই শহরে, আত্মীয়ের বাড়িতে রাত্রিকাটানো ছাড়া মেয়েদের আর কোনো গত্যন্তর নেই।

অফিসের পাট চুকিয়ে পারমিতা প্রথমে পল্টুদের বাড়িতে গিয়েছিল। ওখান থেকে নিজের হোল্ড-অল ও সুটকেস সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়বার সময় মাসীমা বলেছিলেন "পল্টু এখনও ফেরেনি যে তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে। যেখানে যাচ্ছ, আশা করি ভাল জায়গা। কোনো অসুবিধে হলে রাত্রে ফিরে এসো কিন্তু। এর নাম কলকাতা শহর। সমর্থ মেয়েদের জন্যে বড় দুশ্চিন্তা হয় আমার।"

অণিমাদির নির্দেশ মতো রাস্তা খুঁজে খুঁজে লেডিজ হোস্টেলে যখন পারমিতা হাজির হলো, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। দারোয়ানের কাছে খবর পেয়ে অণিমাদি নিচে নেমে এলেন। অনেকদিন পরে পুরনো কলেজের বান্ধবীকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর ব্যাগটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। সুপারভাইজার মিসেস ভায়োলেট খান্নাকে পাওয়া গেলো না—এই সময়টা তিনি রোজই কোথায় বেরিয়ে যান। বেয়ারাই খাতাপত্তরে সইয়ের ব্যবস্থা করে দিলো।

নিজের ঘরে পারমিতার মালপত্তর তুলে অণিমাদি জিজ্ঞেস করলেন, "হোস্টেল খুঁজে বার করতে অসুবিধে হয়নি তো?"

পারমিতা একটু রসিকতা করলো। "আপনার মতো সুন্দরী মহিলারা যেখানে থাকেন, সে-বাড়িটা তো কলকাতা শহরে ওয়েলনোন হবেই। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলতেই সোজা নিয়ে চলে এলো।"

ট্যাক্সির কথা উঠতেই অণিমাদির মুখ কালো হয়ে উঠলো। "ট্যাক্সি! রাতের অন্ধকারে তুমি একলা-একলা ট্যাক্সিতে এলে।"

বেশ অবাক হয়ে গেলো পারমিতা। "ট্যাক্সি ছাড়া আসবো কী করে?"

"কেন? মিনিবাসে, কিংবা শাট্‌ল ট্যাক্সিতে, কিংবা বাসে—ওইটুকুতো লগেজ তোমার।"

পারমিতা এখনও অণিমাদির উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারছে না।

অণিমাদি বললেন, "ট্যাক্সিওয়ালাটা কোথাকার লোক?"

এবার হেসে উঠলো পারমিতা। "কোথাকার লোক, কী নাম, টেলিফোন নম্বর কত, এসব ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে যাবো কোন দুঃখে অণিমাদি।"

"রাখো রাখো!" আবার বকুনি লাগালেন অণিমাদি। "কলকাতায় একলা আসছো, অথচ এই সামান্য কথাটুকু তোমাকে কেউ বলে দেয়নি? সন্ধ্যোবেলায় মেয়েদের একলা ট্যাক্সি চড়া বারণ।"

"কই, কলকাতা সম্পর্কে এমন কোনো খবর তো কাগজে বেরোয়নি?"

পারমিতা এবার অণিমাদির বিছানায় বসে পড়লো।

"খবরের কাগজে আর ক'টা খবর বেরোয়?" অণিমাদি এবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন। "ট্যাক্সিতে কী হয়ে থাকে, আজকেই শুনিয়ে দেবো—আসুক পাশের ঘরের মেয়েরা।"

কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে টোকা পড়লো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লো একটি মেয়ে। অণিমাদি বলেন, "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—বিহারের শীতলপুরে আমি যে-কলেজে পড়তাম সেখানকার জুনিয়র ফ্রেন্ড পারমিতা মুখার্জি। একটা চাকরি নিয়ে সবে কলকাতায় এসেছে। এখানে থাকবে। আর এই মিষ্টি মেয়েটি আমাদের পাশের ঘরে থাকে। মাধবী ত্রিবেদী—হিন্দুস্থান সিগারেট কোম্পানির রিসেপশনিস্ট, বাংলায় যার নাম দিয়েছি আগন্তুক সেবিকা!"

ওরা দুজনে দুজনকে হাল্কা নমস্কার করলো। মাধবী ত্রিবেদী অফিস থেকে ফিরে ইতিমধ্যেই একপ্রস্থ জামাকাপড় পাল্টে আবার বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। অণিমাদি বললেন, "মাধবী, কলকাতার ট্যাক্সির ব্যাপারটা পারমিতাকে একটু বলো তো।"

ফরাসী কসমেটিক্‌সের সুবাস ছড়িয়ে শাড়ির আঁচল টাইট করতে করতে মাধবী বললো, "আমার কলিগ সুনন্দা, গতমাসে মেট্রোর সামনে থেকে সন্ধে সাড়ে-আটটার সময় এক ট্যাক্সিতে চেপে বসেছে। ঘটোৎকচের মতো বিরাট একটা ড্রাইভার—একমুখ দাড়ি, গায়ে বোঁটকা গন্ধ। সুনন্দা

বললো, চৌরঙ্গী রোড ধরে আশুতোষ মুখার্জি রোড হয়ে কালীঘাট যাও। সে ব্যাটা শুনলো না, সোজা গান্ধী স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে রেসকোর্সের কাছে গাড়ি নিয়ে ফেললো। ঘটোৎকচ ভেবেছে, সন্ধেবেলায় সাজুগুজু করে যেসব মেয়ে একলা ট্যাক্সি ধরে তাদের উদ্দেশ্য একটাই।"

"তারপর?" ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো পারমিতা।

মাধবী বললো, "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে গিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় গাড়ি থামিয়ে লোকটা....."

মাধবী সবিস্তারে ঘটনাটা বর্ণনা করতো, কিন্তু হঠাৎ বেয়ারা এসে খবর দিলো এক সাহেব এসেছেন এবং মাধবী দিদিমণির জন্যে তিনি গাড়িতে অপেক্ষা করছেন। "অপেক্ষা করতে বলো," এই বলে মাধবী ঘটনাটা দ্রুত বর্ণনা করলো।

মাধবী নিজেই উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বহু কষ্ট করে, কান্নাকাটি করে, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুনন্দা সেদিন ঘটোৎকচের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিল। ব্যাটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইছিল না যে সুনন্দা ইনোসেন্ট ভদ্র ঘরের মেয়ে।" মাধবী একটু থামলো, তারপর, "আচ্ছা, চলি—পরে দেখা হবে," এই বলে দ্রুত বিদায় নিলো। অণিমাদি হেসে বললেন, "অত ছটফটানি কিসের? গাড়ি নিয়ে রাস্তায় একটু দাঁড়িয়ে থাকুক না।"

মাধবীর মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললো, "ইচ্ছে তো করে দাঁড় করিয়ে রাখতে। কিন্তু নো পারকিং এরিয়া যে—গাড়ি দেখলেই পুলিশ চালান করে দেয়।"

মাধবী যাবার সময় আবার বলে গেলো, "কখনও একলা ট্যাক্সি চড়বেন না।"

"তুমি অচেনা বলে, মাধবী অনেকটা ব্যাপার চেপে গেলো," অণিমাদি মন্তব্য করলেন। অণিমাদির নির্দেশ মতো বেয়ারা এতোক্ষণে চা নিয়ে এসেছে। ঘরের কোণে রাখা আমূল স্প্রের কৌটো থেকে অণিমাদি বিস্কুট বার করলেন। বললেন, "বিস্কুটের দাম ওরা বেশি নেয়, তাই প্রাইভেট ব্যবস্থা রেখেছি। জলখাবার যতদূর সম্ভব নিজে ব্যবস্থা করলে

খরচ কম হয়।"

চায়ের সঙ্গে বিস্কুট ডুবিয়ে অণিমাদি বললেন, "খোদ আমেরিকাতেও এখন নাকি চা কিংবা কফিতে বিস্কুট ডুবিয়ে খাবার রেওয়াজ চালু হয়েছে। আমাদের এখানে দুটো ক্যানাডিয়ান মেয়ে উঠেছিল—তারা তো ওই ভাবেই বিস্কুট খেলো।"

বিস্কুটের প্রসঙ্গ এড়িয়ে অণিমাদি বললেন, "মাধবীর বন্ধু সুনন্দা সেদিন অত সহজে ট্যাক্সিওয়ালার কাছে ছাড়া পায়নি। কিছু কিছু কাঁচাখেকো পুরুষমানুষ আছে এই শহরে, কাকুতি-মিনতিতে তাদের নরম করা যায় না। সুনন্দা ব্যাপারটা একেবারেই চেপে গিয়েছে, পুলিশ তো দূরের কথা, স্বামীকেও বলতে সাহস করেনি।"

কলকাতা শহর সম্বন্ধে অনেক সোনার স্বপ্ন আছে পারমিতার। নর্থ ইন্ডিয়ার অনেক শহরে কিছু অসভ্য যুবক ও ছাত্রদের কথা পারমিতা শুনেছে, নিজেদেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে—কিন্তু সে এতোদিন শুনেছে, কলকাতা আলাদা। কলকাতার মতো আদর্শবাদী শহর এখনও ভারতবর্ষে নেই।

অণিমাদি বললেন, "সেটা ভিড়ের মধ্যে। যেখানে ভিড় সেখানেই আদর্শ—কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু একলা হলেই সভ্য সমাজের আইনকানুন পাল্টে যায়—সুযোগ বুঝে মনের বাঘ বনে বেরিয়ে আসে।"

অণিমাদি না থাকলে পারমিতা বেশ বিপদে পড়ে যেতো। কলকাতা শহরে মেয়েদের পক্ষে একলা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যে কত শক্ত তা পারমিতার জানা ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা কারণে হাজার হাজার লাখ লাখ মেয়ে কাজের প্রয়োজনে অন্দরমহল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু তাদের জন্যে কারও চিন্তা নেই। কলকাতাকে সেই আদ্যিকালের পুরুষ শহর করে রাখা হয়েছে। "লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খরচ করে এখানে সরকারী অতিথিশালা তৈরি

হচ্ছে, ফরেন ট্যুরিস্টদের যাতে পান থেকে চুন না খসে তার জন্যে চার-তারা পাঁচ-তারার হোটেল হচ্ছে, কিন্তু মেয়েরা যে ঘরের বাইরে এসে কোথায় মাথা গুঁজবে সে-বিষয়ে কারও চিন্তা নেই। ভাগ্যে ওয়াই-ডবলু-সি-এ আর এই লেডিজ হোস্টেলের মতো দু-একটা ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠান ছিল—তাই কিছু মেয়ে অন্তত বাঁচছে।"

অণিমাদি বললেন, "আমাদের এখানে জায়গার খুব অভাব। কত মেয়ে যে এখানে আসবার জন্যে ছটফট করছে, কী বলবো। তুমি আপাতত আমার ঘরেই থাকো। তারপর যদি কোনো মেয়ের বিয়ে থা হয়, নিশ্চয় ঘর ছেড়ে দেবে—তখন তোমাকেও একটা আলাদা ঘর পাইয়ে দেওয়া যাবে।"

ঘরে দুটো কাঠের আলমারি ছিল। তার একটা চটপট খালি করে দিলেন অণিমাদি, বললেন, "তোমার ঘর-সংসার আপাতত ওখানেই গুছিয়ে ফেলো।"

নিজের ব্যাগটা খুলে পারমিতা জামাকাপড় সাজাতে লাগলো। "কসমেটিক্‌সগুলো ড্রেসিং টেবিলে রেখো—ওটা দুজনকেই শেয়ার করতে হবে," অণিমাদি বললেন।

এর আগে পারমিতা কোনোদিন হোস্টেলে থাকেনি। এই নতুন জীবন সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

অণিমাদি বললেন, "প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে—তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। গোড়ার দিকে আমারও খুব খারাপ লাগতো। নতুন জায়গায় একটা ঘরে একলা শোয়া সে এক বিশ্রী ব্যাপার। তখন আবার ঘরের খিল ছিল না—অ্যালুমিনিয়ামের ক্লিটটা নড়বড় করছে। রাত্রে ঘুম আসে না আমার। পরের দিন প্রথমেই বেয়ারাকে আলাদা পয়সা দিয়ে ভিতরে খিল এবং তালাচাবি লাগাবার ব্যবস্থা করলাম।"

অণিমাদি শাড়ি ছেড়ে একটা হাউসকোট পরে বসে আছেন। ওঁর স্নান হয়ে গেছে। পারমিতাকে স্নান সেরে নিতে বললেন অণিমাদি। দেরি করলে অনেক সময় জল থাকে না। কিছু কিছু মেয়ে আছে, স্নান ঘরে ঢুকলে আর বেরোতেই চায় না। মাথাপিছু জল খরচের কমপিটিশানে

পিটপিটে বাঙালী মেয়েগুলোর তুলনা মেলা ভার। অমৃতা প্রীতম্ বা প্রতিভা কাপুর এদিকে ভাল—কম জলে ওরা নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে জানে।

লেডিজ হোস্টেলে এই ঘরটাতে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম আছে। স্নান সেরে লম্বা করিডর দিয়ে হেঁটে আসতে হয় না। পারমিতা এবার তোয়ালে হাতে স্নানঘরে ঢুকে পড়লো।

সাবানের বাক্সটা খুঁজে পাচ্ছে না পারমিতা—বোধহয় তাড়াহুড়োতে পল্টুদের কলঘরে ফেলে এসেছে। অণিমাদি বললেন, "আমার কাছে একটা নতুন সাবান রয়েছে, এখন ওইটা নাও।"

অণিমাদির সাবানটা নিয়েই পারমিতা আবার বাথরুমে ঢুকে পড়লো। অণিমাদি পা মুড়ে নিজের ছোট্ট খাটের ওপর বসে রইলেন—তারপর কী ভেবে বেড্ কভার না সরিয়েই টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে ছোটবেলার এবং ছাত্রীজীবনের ছবিগুলো তিনি আবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। পারমিতার থেকে অণিমাদি কলেজে দু বছর সিনিয়র ছিলেন—কিন্তু তবু কি করে যেন ওদের দলের সঙ্গেই অণিমাদির বেশি ভাব হয়ে গিয়েছিল।

পশ্চিমের শীতলপুর টাউনের একই অঞ্চলে পারমিতা ও অণিমারা থাকতো। কলেজ যাওয়ার পথেই ওদের দুজনের দেখা হয়ে যেতো। এক সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কতদিন কলেজে গিয়েছে দুজনে। মাঝপথ থেকে আরও দু-একটা মেয়ে যোগ দিতো। তারা পারমিতার সঙ্গেই পড়তো। অণিমাকে তাই ওদের জেনারেল গার্জেনের দায়িত্ব নিতে হতো পথে। পারমিতার ওপর অণিমার দায়িত্ব একটু বেশি ছিল—কারণ পারমিতার দিদি রুবি এক সময় তার সহপাঠিনী ছিল। পারমিতার মতো রুবিও ছিল তড়বড়ে। রুবিটার পড়াশোনা হলো না। ফাস্ট ইয়ার শেষ করবার পরেই রুবির বিয়ে হয়ে গেলো—রুবির বর ওখানেই চাকরি করে। কথা ছিল বিয়ের পরও রুবি পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। একমাস শ্বশুর-বাড়িতে ঘর করে রুবি যখন বাড়িতে ফিরে এলো তখন অণিমা খোঁজ করতে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, "কবে থেকে কলেজ যাবি?"

রুবি একটু লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। রুবির মা তার কারণটা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। "রুবি কলেজে যাবে কি? ওর শরীর ভাল নেই, ছেলেপুলে হবে।"

দৃশ্যটা পারমিতারও স্পষ্ট মনে আছে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে সে তখন তৈরি হচ্ছে। অণিমাদির ঘরে স্নান করতে করতে স্বভাবতই রুবির কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। রুবিই প্রথম অণিমাদিকে ওদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। অণিমাদি তখন টো টো করে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতো। মায়ের বকুনি সত্ত্বেও রুবিদি আর অণিমাদি দুজনে সমস্ত শহর চষে বেড়াতো—নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকতো, দেড় মাইল দূরের বাংলা লাইব্রেরি থেকে বই আনতো। খুব বৃষ্টি হলে রিকশা করে বাড়ি ফিরতো।

রুবির গায়ের রংটা ছিল ধবধবে ফর্সা—দামী অলিভ অয়েল না-মাখলেও তার ত্বক ছিল মোলায়েম ও নিখুঁত। আর চোখ দুটো ছিলো পারমিতারই মতন—বিরাট টানা টানা এবং ভ্রূদুটি নাকের উপরে এসে জুড়ে গিয়েছে। রুবিটাও ভীষণ দজ্জাল ছিল—কলেজের গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তো। এই দিদির যার সঙ্গে বিয়ে হলো সেও বেশ স্মার্ট চৌকশ ছেলে। শৈলেনদা তখনও শহরে নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। অণিমা, পারমিতা, রুবি তিনজনেই, বিয়ের সম্বন্ধ হবার আগেই গান্ধী ময়দানে শৈলেন চ্যাটার্জির খেলা দেখেছে।

অণিমাদি যখন বিয়ের পর রুবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন, পারমিতা তখনও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। অণিমাদির ইচ্ছে ছিল, আগেকার মতো দুজনে আবার নদীর ঘাট পর্যন্ত বেরিয়ে আসেন। রুবির এখন সুবিধে—বিয়ে হয়ে গেছে, সিঁথিতে লাল সিঁদুরের লাইসেন্স জ্বলজ্বল করছে, কেউ আর বদনাম ছড়াতে সাহস করবে না।

কিন্তু রুবি বেরুতে রাজী হলো না—এই সময় নাকি খুব বেশি হাঁটা-চলা পাড়া-বেড়ানো ভাল নয়। পারমিতা বলেছিল, "বিয়ের সময় তো অনেক টাকা পেয়েছিস—যা রিকশা করে ঘুরে আয় অণিমাদির সঙ্গে।"

রিকশা! সে তো আরও ডেঞ্জারাস এই অবস্থায়, পারমিতা ঠিক

বুঝতে পারেনি। এই এক মাসে কী এমন হলো যে দিদির জীবনের ধারাই পাল্টে যাবে। যে-মেয়ে গাছে চড়ে পেয়ারা পেড়ে দিয়েছে, সাইকেল চালিয়েছে, এমন কি লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে একবার বাজী লড়ে সাইকেল রিকশা চালিয়েছিল, সে-মেয়ে একেবারে কেমন জবু-থবু মেরে গেলো।

বিয়ে মানেই কি জবু-থবু হয়ে যাওয়া? পারমিতা তখনও ভেবেছে। কই বিয়ের পর তো শৈলেনদার জীবনে তেমন কিছু পরিবর্তন হলো না। শৈলেনদা লক্ষ্ণৌ থেকে ফুটবল ট্রফি জিতে এলেন—গান্ধী ময়দানে সেদিনও দুখানা গোল দিয়ে হাততালি লুটলেন। ছেলে তো দিদির একার হবে না—ছেলে তো শৈলেনদারও। অথচ দিদিই মাত্র কয়েকটা সপ্তাহে কোথা থেকে কোথায় পিছিয়ে গেলো। বি.এ. পাস করবার খুব ইচ্ছে ছিল দিদির—সেসব এখন মাথায় উঠলো। দিদির যা হালচাল দেখছে, তাতে দু দিন পরে কলেজের ঐ সব বইপত্তর জ্বালিয়ে দিদি হয়তো ছেলের দুধ গরম করবে।

দিদিকে এসব কথা বলতে পারতো পারমিতা—কিন্তু দিদি কষ্ট পাবে। তার ওপর দিদির শরীর খারাপ এবং যা হয়ে গিয়েছে, তার থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় তো নেই দিদির। কিন্তু অণিমাদির সঙ্গে টো টো কোম্পানি করবার সময় পারমিতা রাগ সামলাতে পারেনি। বলেই ফেলেছে, "ছেলে হবে দুজনেরই—অথচ শৈলেনদা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফুটবল খেলে বেড়াচ্ছে—আর দিদি বেচারা রিকশা চড়তেও সাহস পাচ্ছে না।"

অণিমাদি বুঝেছিলেন, পারমিতা রেগে আছে। অণিমাদি কিন্তু হাসেন নি। পারমিতাকে বলেছিলেন, "তোমার এখন খুব কম বয়েস, তাই এইসব জিজ্ঞেস করতে পারছো—আর একটু বুঝতে শিখলে তখন আর রাগ করবে না, বুঝবে—মেয়েদের অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়।"

"সহ্য করবার জন্যেই তা হলে মেয়েদের তৈরি করা হয়েছে, আপনি বলতে চান, অণিমাদি?" পারমিতার তখন আর কতই বয়স? কিন্তু বয়সের তুলনায় বোধহয় সে একটু বেশি পরিণত ছিল।

অণিমাদি তখন কিন্তু রাগ করেননি। রুবির আকস্মিক এই পরিবর্তনের জন্যে নিজেও বেশ দুঃখের মধ্যে ছিলেন। বলেছিলেন, "আমার অবস্থা তো তোমারই মতো মিতা—এসবের আদৌ কোনো উত্তর আছে কিনা তাও জানি না।"

শাওয়ারের তলা থেকে সরে এসে পারমিতা ঘাড়ে, হাতে, মুখে ভাল করে সাবান ঘষে নিলো। এমন অসময়ে আবার কেন অনেকদিন আগেকার হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে? এখন এসবের সময় নেই। পারমিতা তো নিজেকে রুবিদির ছাঁচে তৈরি করেনি।

সাবান মেখে পারমিতা আবার শাওয়ারের তলায় এসে দাঁড়ালো। অণিমাদির সঙ্গে কলেজ জীবনে অনেক সময় কাটিয়েছে পারমিতা। দু বছরের সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অণিমাদির জন্যে কলেজ জীবনটা বেশ আনন্দেই কেটেছে পারামিতার। অণিমাদি তখন বেশি কথা বলতেন না—আর পড়াশোনায় তাঁর নাম-ডাক তখন প্রচণ্ড। দু বছর পরে অণিমাদি চলে গেলেন দিল্লীতে পড়তে। ওখান থেকেই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শেষ করে, রিসার্চের কাজে অণিমাদি এসেছিলেন কলকাতায়। সেই সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষাসদনে ঢুকেছিলেন লেকচারার হিসাবে।

চিঠিপত্রে অণিমাদির সঙ্গে সংযোগটা ছিন্ন হয়নি পারমিতার। তাই কলকাতায় চাকরির কথা উঠতেই প্রথমে বাবা চিন্তায় পড়েছিলেন। চিরকাল বাংলার বাইরে বাইরে বদলির কাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত রিটায়ার করেও শীতলপুর টাউনে রয়ে গেলেন। কলকাতায় কোনো আত্মীয়স্বজন নেই।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে পারমিতা দেখলো অণিমাদি হাউসকোট পরে নিজের বেডে শুয়ে রয়েছেন। বাথরুমটা যা ছোট এবং ভিজে তাতে কাপড় পাল্টানো বেশ শক্ত। শুকনো কাপড়টা পারমিতা কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। ঘরের মধ্যে এসে সে কাপড়টা ঠিক করে পরতে লাগলো।

অণিমাদি বললেন, "এই সব হাঙ্গামার জন্যে হোস্টেলে আজকাল হাউসকোটটা খুবই চলছে, মিতা। শাড়ির প্রশংসা করে দুনিয়ার লোক

ইন্ডিয়ান মেয়েদের যতই মাথায় তুলুক, জামাকাপড়ের ব্যাপারে মেমসায়েবরা অনেক প্র্যাকটিক্যাল ! তারা যে-সব জামাকাপড় পরে তার হাঙ্গামা অনেক কম। নেকস্ট প্র্যাকটিক্যাল হলো পাঞ্জাবীরা—ওরা প্রায় মেমসায়েবদের ধরে ফেলেছে। শাড়িকে ওরা যেভাবে পিছনে ফেলে দিচ্ছে, তাতে শাড়ির অবস্থা শেষ পর্যন্ত ধুতির মতোই হয়ে দাঁড়াবে।"

নিজের সিঙ্গল বেডটা ঘরের আরেক কোণে রয়েছে। সেইটার ওপর বসে পড়লো পারমিতা। পড়াশোনা করবার টেবিল-চেয়ার মাত্র একখানা। অণিমাদি বললেন, "লেডিজ হোস্টেলে পড়াশোনার বালাই নেই বললেই হয়। আমিই জোর করে একটা ছোট টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা রেখেছি। এখানকার অন্য মেয়েরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইভ্‌স উইকলি, ফেমিনা পড়ে—এবং ম্যাগাজিনের ওপর কাগজের প্যাড রেখে নিতান্ত প্রয়োজন হলে এক-আধখানা চিঠি লেখে।"

পারমিতা বললো, "পড়াশোনার বালাইটা ছেলেরাও আজকাল তুলে দিয়েছে। শুধু মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ কী?"

অণিমাদি বললেন, "তুমি তো খুব লেখাপড়া করতে। এখনও সেই স্বভাব রেখেছো?"

"পড়বার ইচ্ছে তো খুব--কিন্তু আমাদের ওখানে মনের মতন বই পাওয়া যায় না! পয়সা দিয়ে কিনে, ক'খানা বই পড়া যায় বলো? কলকাতায় আসবার এটাও একটা লাভ—আপনাদের এখানে কত লাইব্রেরি!"

অণিমাদি বললেন, "পড়বার ইচ্ছে থাকলে, প্রায় বিনা পয়সাতেই কলকাতায় বই পড়া যায়। তোমার আগ্রহ থাকলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল, অক্সফোর্ড লেন্ডিং লাইব্রেরি, ইউ এস লাইব্রেরির ফর্ম আনিয়ে দেবো।"

"আমাদের অফিসেও একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে, জানেন অণিমাদি। আমার অ্যাসিসটেন্ট অনাদিবাবু বললেন, সেখানে শুধু বাংলা এবং তামিল বই আছে।"

অণিমাদি বললেন, "আমাদের কলেজ লাইব্রেরিটা বিরাট। লাইব্রেরি

কমিটিতে আছি—তাই মনের খুশী মতো বই কেনা যায়। প্রথম দিকে পড়তামও—এখন আর ভাল লাগে না। বইপড়া বিদ্যে নিয়ে মেয়েমানুষদের কোনো উপকার হবে বলে মনে হয় না।"

এসব কী বলছেন অণিমাদি। তিনি নিজেই তো বইয়ের পোকা ছিলেন। "হয়তো এটা জীবনের একটা ফেজ। এখন আমার বই পড়তে তেমন ইচ্ছে করে না।" অণিমাদি বললেন।

পারমিতা বললো, "ভাগ্যে আপনি কলকাতায় ছিলেন। না-হলে কলকাতায় এসে অসুবিধা হতো।"

"বাবা ভাবছিলেন, মেয়ে কোথায় এসে থাকবে," অণিমাদি জিজ্ঞেস করলেন।

"বাবাকে তবু ম্যানেজ করা যায়। মুশকিল হচ্ছে মাকে নিয়ে। মার ধারণা কলকাতা শহরের প্রত্যেকটি ব্যাটাছেলে তাঁর মেয়েকে একলা পেয়ে বিপদে ফেলবার জন্যে ওৎ পেতে আছে!"

"বাবা কী বললেন?" অণিমাদি জানতে চাইলেন।

"বাবা বললেন, 'মিতাকে তো আমি সেভাবে মানুষ করিনি। ও যেখানেই যাক আমার কোনো চিন্তা নেই।' মা প্রথমে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন। তারপর আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'তুমিই মেয়েটার সর্বনাশ করলে। ক'টা টাকার লোভে সমর্থ মেয়েকে একলা তুমি কলকাতায় পাঠাচ্ছো?"

"তারপর?" অণিমাদি জিজ্ঞেস করলেন।

পারমিতা বললো, "বাবা তখন মাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'মেয়েরা আজকাল একলা একলা লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, টরন্টো যাচ্ছে। সেখানে তো আর চেনাশোনা গার্জেন পাওয়া যায় না?' কিন্তু মার সেই এক কথা—'কলকাতা তোমার লন্ডন নয়।' শেষ পর্যন্ত আপনার কথা উঠতে, মা একটু শান্ত হলেন। আপনার ওপর মায়ের অগাধ বিশ্বাস। ওঁর সামনেই আপনাকে চিঠি লিখে দিলাম। আসবার সময় মিথ্যে কথা বলতে হলো, আপনি উত্তর দিয়েছেন এবং স্টেশনে থাকবেন। তবে কাজের সুবিধের জন্যে মায়ের দূর সম্পর্কের বন্ধুর বাড়িতে প্রথম দিনটা

থাকবো।”

অণিমাদি বললেন, “তোমার খুব সাহস বলতে হবে, যদি এখানে সীট জোগাড় করতে না পারতাম?” পারমিতা বিশেষ পাত্তা দিলো না অণিমাদিকে। “আমি অত পিটপিট করে ভাবতে পারি না। হাজার হাজার লোক যেভাবে অপরিচিত শহরে গিয়ে রাত কাটায়—আমিও সেভাবে কাটাতে পারবো না কেন? ভয় করেই আমরা বাঙালী মেয়েগুলো মরলাম।”

অণিমাদি আশ্বস্ত হতে পারলেন না। পারমিতা বললো, “আমার চাকরির ইন্টারভিউতে কোম্পানির চেয়ারম্যান মিস্টার চৌধুরী জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আমরা যে লোক খুঁজছি, তাঁকে মাঝে মাঝে ট্যুরে বেরুতে হতে পারে। আপনার কোনো অসুবিধা নেই তো?’ আমার কোনো দ্বিধা হয়নি। সোজা বলে দিলাম, ট্যুরে যেতে আমার মোটেই আপত্তি নেই। বরং নতুন নতুন দেশ দেখতে আমার ভাল লাগে।”

অবাক হয়ে গেলেন অণিমাদি। “খুব তো লেকচার দিয়ে দিলে, ছোটখাট জায়গায় গিয়ে থাকবে কোথায় বাছাধন?”

“ওসব মাইনর ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েই আমাদের মেয়েজাতের কিছু হলো না অণিমাদি। অ্যামবিশন না থাকলে মেয়েরা বড় হতে পারে না। এই যে আমি মফস্বল শহরের মেয়ে কলেজে লেকচারার হয়ে কিছু টাকা রোজগার করছিলাম, আর বাবা-মায়ের আশ্রয়ে থেকে ভাত মাছের ঝোল খাচ্ছিলাম—এ আমার ভাল লাগলো না। আমি ভাবলুম, কেরিয়ার যদি করতেই হয়—তা হলে কোনো অফিসে জয়েন করতে হবে। দুটো ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করেছিলাম—এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। দু'বারই পাটনায় ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছি। আর এবার বক্স নম্বর দেখে অ্যাপ্লিকেশন ছেড়েছিলাম। কোম্পানির খরচে এলাম কলকাতায় ইন্টারভিউ দিতে। মা কিছুতেই ছাড়লেন না—সঙ্গে বাবাকে পাঠালেন। হাওড়া স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে বাবাকে বসিয়ে, আমি এলুম ইন্টারভিউ দিতে। মিস্টার চৌধুরী কাজের মানুষ—সিলেকশনের নাম করে ক্যান্ডিডেটদের মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রাখলেন না। প্রথম দিন লিখিত পরীক্ষা হলো—পরের

দিন সকালে আবার আসতে বললেন। আমি ফিরে গিয়ে রিটায়ারিং রুমে বাবার কেয়ারে রাত্রি কাটালাম। পরের দিন বাবাকে পাঠালাম মিউজিয়াম এবং প্লানেটোরিয়াম দেখতে। হিন্দুস্থান হোটেলে আমাদের ইন্টারভিউ হলো। প্রথম রাউন্ড শুরু হলো সকাল সাড়ে ন'টায়। ফার্স্ট রাউন্ড থেকে ফাইন্যাল রাউন্ডের জন্যে বেছে নেওয়া হলো তিনজনকে। দুজন ছেলে এবং আমি একমাত্র অবলা। লাঞ্চের পর সুদর্শন চৌধুরী নিজেই আমাদের বাজিয়ে দেখলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। চারটের সময় জানতে পারলাম—আমারই চাকরি পাবার চান্স।"

"বেশ নাটকীয় তো", অণিমাদি বললেন।

"নাটকীয় কিনা জানি না—তবে ছোঁড়া দুটোর মতো আমার অত ভয়ডর ছিল না। আমার তো পেটের ভাবনা নেই—কলেজে একটা বাঁধা পোস্ট তো রয়েছে। আমার যা মনে এসেছে তাই সুদর্শন চৌধুরীর মুখের ওপর বলে দিয়েছি।"

একটু থামলো পারমিতা। তারপর আবার বললো, "সুদর্শন চৌধুরী আমাকে ফাইন্যাল ইন্টারভিউতে বললেন, কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রী বড় নীরস জায়গা—মেয়েদের কী এসব ভাল লাগবে? আমি সোজাসুজি বললুম, সুযোগ দিয়ে দেখুন। সুযোগ পায়নি বলেই মেয়েরা এ-লাইনে এতোদিন কিছু করে উঠতে পারেনি। সুদর্শন চৌধুরী কর্মক্ষেত্রে এ-রকম মুখঝামটা বোধহয় আগে কখনও শোনেননি। আমার মুখের দিকে ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে তাকালেন। আমি বললাম, সুযোগ পেলে মেয়েরা হয়তো বিজনেসে খুব ভালই করবে, মিস্টার চৌধুরী। মিস্টার চৌধুরী তারপরেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি কবে জয়েন করতে পারি। আমি কলেজের হাঙ্গামা কাটাবার জন্যে চার সপ্তাহ সময় চেয়ে নিয়েছিলাম। তবে সেই সঙ্গে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও চেয়েছিলাম। মিস্টার চৌধুরীর কথা মতো ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট অফিস থেকে মেডিক্যাল পরীক্ষার চিঠি সঙ্গে সঙ্গে ইসু করেছিল। আমি সেইদিনই ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে, বাবাকে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলাম। সুদর্শন চৌধুরী কথা রেখেছিলেন, মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়া মাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সই করে পাঠিয়েছিলেন।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার টেবিলে গেলেন না অণিমাদি। বললেন, "আজ প্রথম দিন। দুজনে মিলে নিরিবিলিতে একটু গল্প করা যাক—কতদিন পরে দেখা হলো। তোমাকে দেখে আমার দশ বছর আগেকার কলেজ জীবনের কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে।"

বিছানায় বসে বসেই খেতে হলো। আর খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো দুজনেই।

"ফ্যানের হাওয়া পাচ্ছো তো?" জিজ্ঞেস করলেন অণিমাদি।

"যথেষ্ট। ফ্যানের হাওয়া ছাড়াও ঘুমোবার অভ্যাস আছে আমার। আমার প্রায় ইচ্ছা-নিদ্রা বলতে পারেন—চোখ বুজলেই ঘুম ছুটে আসে। তারপর কী যে হয় আমার খেয়ালই থাকে না।"

অণিমাদি গায়ের ওপর একটা পাতলা চাদর টানতে টানতে বললেন, "সেটা তো খুব ভাল। ক'টা মেয়ে আর আজকাল ঘুমকে চাকর করে রাখতে পারছে? ঘুম তো আমার ঠাকুরের মতো—কবে দয়া করে দেখা দেবেন, সেই আশায় রাতের প্রহর গুনি। কত সাধ্যসাধনা করি—ঘাড়ে জল দিই, বিছানায় শুয়ে এক হাজার পর্যন্ত ভেড়া গুনি, উঠে পড়ে ট্যাবলেট খাই, তবে একটু ঘুমের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের জানা-শোনা এখানে যত মেয়ে আছে, তাদের বেশির ভাগই ঘুমকে কেষ্ট ঠাকুরের মতো ভজনা করে। মাধবী বেচারা তো মাঝে মাঝে রাতদুপুরে আমার ঘরে টোকা দেয়, কান্নাকাটি করে।"

পারমিতা এসবের অর্থ বুঝতে পারে না। বললে, "ঘুম কি পুরুষমানুষ? না হলে মেয়েদের ওপর এত অবিচার করে কেন?"

অণিমাদি বললেন, "ওরকম যা তা বোলো না মিতা—ঘুমতাড়ানি মাসী শেষে তোমার ঘাড়েও ভর করবে।"

বেশ জোরেই হাসলো পারমিতা। "আসুক না একবার বুড়ী, পিটিয়ে তাকে বিদায় করবো।"

অণিমাদি জিজ্ঞেস করলেন, "বেশ তো নিজের জায়গায় বাপ-মায়ের কাছে ছিলে। ওদের ছেড়ে একলা একলা কলকাতার এই কষ্ট ভাল লাগবে তোমার?"

"খুব ভাল লাগবে। বছরের পর বছর মেয়ে ঠেঙিয়ে, ক্লাসে প্রমোশন দিয়ে আমি কেন নিজের দেহ এবং মনে জং ধরাবো অণিমাদি? আমি উন্নতি করতে চাই অণিমাদি—আমার অ্যামবিশন আছে।"

অ্যামবিশন! উচ্চাশা! কথাগুলো ঘুরে-ফিরে অণিমাদির চোখের সামনে ফ্লুওরেসেন্ট আলোর মতো জ্বলে উঠছে। মেয়েদের আশার যে একটা সীমানা আছে একথা বোঝবার বয়স কি পারমিতার এখনও হয়নি? কলকাতায় অফিসপাড়া কোনো মেয়ের সুদীর্ঘকাল ভাল লাগতে পারে এ-কথা অণিমাদি বিশ্বাস করেন না।

অণিমাদি ভাবলেন একবার পারমিতাকে বলেন, "চাকরি এবং কেরিয়ারের পুরুষমানুষী নেশায় না মেতে যেসব মেয়ের উপায় আছে, তাদের উচিত সময় থাকতে সংসারে ঢুকে পড়া।" কিন্তু এসব কথা তুলে লাভ নেই, পারমিতা এখনই তাঁকে উল্টো প্রশ্ন করে বসবে।

পারমিতার দিদির কথাও অণিমার মনে পড়ে যাচ্ছে। এতোদিনে ওরা হয়তো দিদির কথা অনেকখানি ভুলে গিয়েছে। ফুলের মতো মেয়ে রুবিকে কম বয়সে বিয়ে দিলেন বাবা-মা। পারমিতা তখন স্কুলের ছাত্রী। এক মাসের মধ্যে সন্তান সম্ভাবনা নিয়ে রুবি বাড়ি ফিরে এলো। অণিমার বাবা বলেছিলেন, মেয়েদের জীবনে এ এক মস্ত ফাঁড়া। কখন কী হয় কেউ জানে না। অণিমার মা অবশ্য একমত হননি। বলেছিলেন, "রুবির যা হলো তা ভবিতব্যের লিখন। মেয়েদের পক্ষে মা হওয়াটা খুবই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার একটা—ঈশ্বর এইভাবেই মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন।" অণিমাদির বাবা বলেছিলেন, "ভগবান জানেন, আর তোমরাই জানো।" মা বকুনি লাগিয়েছিলেন, "বাজে বোকো না, মেয়ে বড় হয়েছে, শুনলে ভয় পাবে।"

তারপর এমনভাবে রুবি যে সকলকে ফাঁকি দিয়ে পৃথিবী থেকে পালাবে একথা কেউ ভাবেনি।

রুবির বর আবার বিয়ে করেছিল, অণিমাদি শুনেছিলেন। একবার ইচ্ছে হলো পারমিতাকে জিজ্ঞেস করেন রুবির বর এখন কোথায়। কিন্তু এই রাত্রে বেচারাকে ওসব জিজ্ঞেস করে লাভ নেই—হয়তো অনেকদিন

ধরে অনেক কষ্ট করে ওদের বাড়ির সবাই রুবি এবং তার বরের কথা কিছুটা ভুলতে পেরেছে।

পারমিতা কি ঘুমিয়ে পড়লো? অণিমাদির আর একটা ভয় ছিল। পারমিতা প্রথম সুযোগেই তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোর কথা জিজ্ঞেস করে বসবে। যেসব প্রশ্ন এখানকার মেয়েরা একটু পরিচিত হলেই জিজ্ঞেস করে বসে। "বিয়ে করেননি কেন?"

এই প্রশ্নের একটা উল্টো প্রশ্ন অণিমা তৈরি করে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, "পাস্ট টেন্‌সে বলছো কেন? আমার কি আর ভবিষ্যৎ নেই ভাবছো?"

অনেকে লজ্জা পেয়ে বলে, "সে কি কথা—যা চেহারাটি রেখেছেন এখনও তিন-চার বার বিয়ের পিঁড়িতে ঘুরিয়ে আনা যায়। কিন্তু বাসর ঘরে না ঢুকে স্ত্রী শিক্ষাসদনের ক্লাস ঘরে সময় নষ্ট করছেন কেন?"

এর উত্তর না দিয়ে অণিমাদি বলেন, "আমার ক্লাস ঘরে যে দেড়শ মেয়ে বসে আছে, তারা যাতে বাসর ঘর আলো করতে পারে তার তদারকি করছি। জানোই তো, ময়রা সন্দেশ খায় না।"

শুধু মাধবী ত্রিবেদী এতো সহজে হেরে যায় না। মুখর ওপর উত্তর দিয়েছিল, "একেবারে বাজে কথা, আজকাল যাদের খাবারের দোকান আছে তারা বেস্ট কোয়ালিটির সন্দেশ নিজেরাই খেয়ে নেয়। আমাদের হিন্দুস্থান সিগ্রেট কোম্পানির প্রত্যেকটি অফিসার কার্টন-কার্টন সিগারেট ফুঁকে উড়িয়ে দিচ্ছে—ইন ফ্যাক্ট সিগ্রেট না-খেলে আমাদের আপিসে চাকরিই হয় না। এমন কি মেয়েদের পর্যন্ত।"

"তুই তা বলে বেশি সিগ্রেট ফুঁকিস না", অণিমাদি সাবধান করে দিয়েছিলেন মাধবীকে। "মুখে টোবাকোর গন্ধ ছাড়লে কোনো বর ভালবাসবে না!" অণিমাদি রসিকতা করেছিলেন।

মাধবীও ছাড়বার পাত্রী নয়। বলেছিল, "বেশ করবো খাবো। নিজেরা ছাই পাঁশ মুখে পুরবে তাতে বেটাছেলেদের দোষ হয় না—যত দোষ মেয়েদের!"

প্রতিভা কাপুর ভাল বাংলা বোঝে। সে ওখানে বসেছিল। সে হেসে

বললো, "কিসিং-এর সময় মুখে সিগ্রেটের গন্ধ পেলে ছেলেদের অসুবিধে হয়।"

"তুমি আর বেশি পাকামো কোরো না প্রতিভা—বিয়েও করোনি এবং সিগ্রেটও খাও না, সুতরাং তোমার কথার ভ্যালু নীল।"

প্রতিভা মেয়েটা ভীষণ ফচকে। কিসিং-এর সঙ্গে বিয়ের যে তেমন কোনো একচেটিয়া সম্পর্ক নেই এই ধরনের একটা কথা সে তুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু অণিমাদি তাকে যথা সময়ে নিরস্ত করেছিলেন। মেয়েগুলো যতই অস্থিরমতি হোক, যতই তারা বিদ্রোহিণী হতে চাক, অণিমাদিকে তারা সম্মান করে চলে—তাঁর কথার অবাধ্য হয় না।

অণিমাদি এবার বিছানা ছেড়ে উঠলেন। শুধু শুধু জেগে না থেকে একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নেওয়া ভাল। আলো জ্বালিয়ে অণিমাদি দেখলেন, পারমিতা সত্যিই অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

পারমিতা মুখার্জি—স্পেশ্যাল অ্যাসিসটেন্ট টু চেয়ারম্যান। এক ফোঁটা এই মেয়েকে খোদ চেয়ারম্যানের ডান হাত করে নেওয়ার কোনো মানে হয়? ভাবলেন মিস্টার ভেঙ্কটরমণ। ঠিক আছে, আজকাল সরকারী সব আপিসে একজন জনসংযোগ অফিসার গোছের অফিসার রাখা হয়, খোদ কর্তার ফাইফরমাস খাটা যার কাজ। হাটে বাজারে কর্তার এবং কর্তার বউ-এর ঢাক পেটানোর জন্যে এদের রাখা হয়; তার ফলে খোদ কর্তার সঙ্গে পি-আর-ওর সাধারণত একটু নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে। আপিসের যে-কোনো লোককে এই পোস্ট দেওয়া হয়ে থাকে—যাকে খুশী। অফিসারটি শুধু একটু বলিয়ে কইয়ে এবং স্মার্ট হওয়া চাই।

পারমিতা মুখার্জিকে এই ধরনের একটা জনসংযোগের কাজ দিয়েই মিস্টার চৌধুরী আপাতত সন্তুষ্ট থাকবেন এমন একটা ক্ষীণ বিশ্বাস মিস্টার

ভেঙ্কটরমণের শেষ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু চেয়ারম্যান সার্কুলারে সোজা জানিয়ে দিয়েছেন মিস মুখার্জি তাঁর বিশেষ সহকারীর কাজ করবেন।

সার্কুলারটা আবার পড়ে সুজন দাশগুপ্তও বাড়িতে ফোন করলেন। "হ্যালো ডলি? তুমি লেডিজ কফি মিট-এ যাওনি?"

বৃন্দা ওরফে ডলি ওধার থেকে বললেন, "যাবো কী করে? আমার কি আর মরবার সময় আছে? তোমার আপহোলস্ট্রির দরজি দেরি করে এলেন। তোমাদের অফিসের প্লাম্বার দশটায় আসবেন বলেছিলেন—এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই।"

"আই অ্যাম ভেরি সরি টু হিয়ার দিস। মিস্টার দেসার সঙ্গে কথা বলছি। ওর অ্যাসিসটেন্ট নীলমণিটা আমাদের মতো অফিসারদের তোয়াক্কাই করে না।"

"লোকটা বেশ গুছনো আছে। ওকে খুশী করবার জন্যে দুখানা ইমপোরটেড ক্যালেন্ডার দিলুম—তবু একটু হেল্প করলো না।" মন্তব্য করলেন বৃন্দা দাশগুপ্তা।

"আমি এখনই আবার নীলমণিকে মনে করিয়ে দিচ্ছি", দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন।

"যদি ওঁরা ঠিক করে থাকেন যে, তোমার মতো অফিসারের ফ্ল্যাটে আর মিস্ত্রি পাঠাবেন না—তাও যেন বলে দেন; আমি নিজেই করিয়ে নেবো। ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ে—ন্যাশনাল অপচয় হচ্ছে, সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না। ওঁরা কি জানেন না কত লোক এই শহরে জলের অভাবে স্নান করতে পারে না।"

দাশগুপ্ত বললেন, "ডলি, তুমি সেদিন যা বললে আমি গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তার মধ্যে ট্রুথ থাকলেও থাকতে পারে।"

"তুমি তো আমার কোনো কথাই কানে নাও না", সুজন-গৃহিণী টেলিফোনের ওপরেই অভিমানে গলে পড়লেন।

সুজন বললেন, "পি-এম সম্বন্ধে খবর আছে।"

পি-এম কথাটির ইঙ্গিত ঠিক করতে না পেরে বৃন্দা বললেন, "প্রাইম

মিনিস্টার? তিনি আবার তোমাদের আপিস সম্বন্ধে কি করবেন?"

"প্রাইম মিনিস্টার কোন দুঃখে আমাদের অফিস সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে যাবেন—আমি পারমিতা মুখার্জির সম্বন্ধে বলছি—যিনি আমাদের ক্ষুদে মিস-পি-এম হতে চলেছেন।"

বৃন্দা বললেন, "আমাদের ময়দান টেন্টে শুনলাম, অনেক আপিসে গভরমেন্ট এইরকম সিক্রেট সার্ভিসের লোক পাঠাচ্ছে। মনে হবে যেন অর্ডিনারি অফিসার হিসাবে জয়েন করেছে—কিন্তু আসলে সি-বি-আই-এর কাজ করবে। দিল্লিতে এই সব ডেনজারাস মেয়েদের ট্রেনিং হয়।"

সুজন দাশগুপ্ত বিব্রত হলেন। বললেন, "থাকগে। ওসব আলোচনা টেলিফোনে না হওয়াই ভাল।"

বৃন্দা বললেন, "যেখানকার লোক হোক্, তোমার কি; তুমি সব লোকের রাইট সাইডে থাকবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তুমি কিছুই কোরো না—শুধু নিজের কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে আজকাল কোনো চাকরিতেই উন্নতি করা যায় না। এমন কি মিলিটারিতেও না, মেজর জেনারেল মিত্তিরের বউ সেদিন বলছিলেন।" একটু থেমে বৃন্দা বললো, "সুযোগ পেলেই তুমি মেয়েটাকে একটু কব্জা করার চেষ্টা করো।"

"এই বয়সে সেই কাজটা কী করে করবো, ডলি?" সুজন দাশগুপ্ত কাতরভাবে বললেন।

"আমাকে কব্জা করবার জন্যে কত রকমের খেলা দেখিয়েছিলে? এই ক'বছরের মধ্যে সেসব ভুলে গিয়েছো, একথা কে বিশ্বাস করবে?" নিজেই হাসলো বৃন্দা। তারপর জিগ্যেস করলো, "রাগ করলে নাকি, মানিক? যাক, এখন রাখছি—একবার কফি মিট-এ যেতেই হবে, মিসেস ভেঙ্কটরমণ আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

একটা চুরুট ধরিয়ে হ্যারিংটন ইন্ডিয়া লিমিটেডের বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্টের চেয়ারম্যান সুদর্শন চৌধুরী তাঁর স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট পারমিতা মুখার্জিকে ডেকে পাঠালেন।

একটু ভারী ধরনের চেহারা সুদর্শন চৌধুরীর। বয়স পঞ্চাশের সীমানায়। মুখটা গোলাকৃতি—নাকটা একটু চাপা। সামান্য একটু খুঁড়িয়ে

হাঁটেন। পুরনো যে-অফিসে কাজ করতেন সেখানে কারখানা তৈরির সময় রাতের অন্ধকারে ইনসপেকশনে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বাঁচবার আশা ছিল না সুদর্শন চৌধুরীর। প্রায় দেড় বছর শয্যাশায়ী থেকে আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছিলেন। শোনা যায় এই অ্যাক্সিডেন্টের ফলেই সুদর্শনের জীবনে অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছিল। এক নম্বর : ক্রিকেট খেলার নেশা ছিল সুদর্শন চৌধুরীর, নাম করা ক্লাবে উইকেট কিপিং করতেন। অকালে ফেয়ারওয়েল জানাতে হয়েছিল ক্রিকেটকে। দু নম্বর : সম্বন্ধ করে বিয়ের ঠিক হয়েছিল এক অসামান্যা সুন্দরীর সঙ্গে, সেই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব। বিয়ের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সুদর্শন চৌধুরীর পদস্খলন হয়। তারপর যখন ডাক্তাররা বললেন, সুদর্শন চৌধুরীর একটা পা কেটে ফেলবার প্রয়োজন হতে পারে, তখন কন্যাপক্ষ পাকা প্রস্তাবকে কাঁচা করে দেন। পাত্রীটি পরবর্তীকালে স্যর নগেন মুখার্জীর ছেলেকে বিয়ে করে সেই ভদ্রলোকের জীবন বীতস্পৃহ করে তোলেন। কেলেংকারি শেষ পর্যন্ত বহু দূর গড়ায়। কোম্পানির কাজে পদস্খলন না-হলে এই মহিলাটি সুদর্শন চৌধুরীর হাড় ভাজা ভাজা করে ছাড়তেন। বিয়ে ভাঙবার পর অনেকদিন সুদর্শন চৌধুরী ব্যাচেলার ছিলেন ; শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন তাঁর চিকিৎসক-কন্যা মৃদুলা ওরফে বুলাকে।

এই বিয়েতে রোমান্স ছিল কিনা তা ঠিক মতো জানা যায় না। অনেকে বলেন, ডাক্তার রায়ের অর্থোপিডিক হোমে সাড়ে-আট মাস শুয়ে থাকার সময়েই দুজনের জানাজানি হয়।

সুদর্শন চৌধুরী তারপর কর্ম জীবনেও দ্রুত উন্নতি করেছেন। নিজের চেষ্টা ও প্রতিভায় দুর্গম প্রমোশনের শিখরে তিনি অনায়াসে আরোহণ করে সবাইকে বিস্মিত করেছেন। নিতান্ত কম বয়সে তিনি হিন্দুস্থান সিগারেট কোম্পানির দু'নম্বর পোজিশন লাভ করেছিলেন। এই আন্তর্জাতিক কোম্পানির ইতিহাসে এতো কম বয়সে কেউ নাকি কখনও ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়নি। তারপর কী যে হলো, সুদর্শন চৌধুরী হঠাৎ একদিন অনুভব করলেন, ফরেন কোম্পানির লাভ আরও মোটা

করবার জন্য জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে দেশের কী মঙ্গল হচ্ছে? কোম্পানির প্রাসাদোপম বাংলোয় বসে বসে নিঃসন্তান সুদর্শন চৌধুরীর এই আকস্মিক বৈরাগ্যের কারণ কী?

অনেকে গুজব রটিয়েছিল, কোম্পানির প্রথম ভারতীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবার প্রতিযোগিতায় একজন কুটিল কাশ্মীরি ব্রাহ্মণের কাছে সুদর্শন পরাজিত হয়েছেন। সেই থেকে এই বৈরাগ্য। কিন্তু সুদর্শন ও তাঁর স্ত্রী জানেন, কথাটা মোটেই সত্য নয়। মোটা অর্থ ও নানা সুখের পরিবর্তে বিদেশী ব্যবসায়ীদের ডলপুতুল হয়ে বসে থাকতে সুদর্শন চৌধুরীর আর ভাল লাগছিল না।

সুদর্শনের স্ত্রী প্রথম দিকে স্বামীকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করেছেন। বুঝিয়েছেন, হোক না বিদেশী কোম্পানি—তুমি তো দেশের কোনো অমঙ্গল করছো না! বরং কত লোকের চাকরি হয়েছে; কত লোক মনের মতো নেশার জিনিস পাচ্ছে, সরকার কত টাকা দেশোন্নয়নের জন্যে পাচ্ছেন তোমাদের মাধ্যমে; তোমরা সবাই মোটামোটা ট্যাক্স নিজেদের মাইনে থেকেও দিচ্ছো।

সুদর্শন চৌধুরী বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রবন্ধে এবং নানা সেমিনারে এবং ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে এক সময় এই ধরনের কথা নিজেই বহুবার বলেছেন। কিন্তু এখন এসব যুক্তিতে মন ভরছে না। বুলা চৌধুরী নিজেও বিদুষী—একদা ইস্কুলে মাস্টারী করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা কম যাও কিসে? অন্য সবার মতো নিজের কাজটুকু করে তোমরা দেশ সেবা করছো—যেমন করছে ডাক্তাররা, মাস্টাররা, সৈন্যরা, চাষীরা, শ্রমিকরা। তাছাড়া তুমি তো চুরি করছো না, গভর্নমেন্টকে ঠকাচ্ছো না। যে মাইনে পাচ্ছো তা তুমি না নিলে আর একটা সায়েব এসে ভোগ করবে।"

সুদর্শন তবুও নিজেকে শান্ত করতে পারেননি। তারপর একদিন খবর প্রকাশিত হয়েছিল, প্রাইভেট সেকটরের বিরাট চাকরি এবং মোগলাই সুখ ত্যাগ করে সুদর্শন চৌধুরী সরকারী উদ্যোগে যোগ দিচ্ছেন—মাইনে এবং সুখ অনেক কম, দায়িত্ব অনেক বেশি। তবু সুদর্শন চৌধুরী ভাবলেন,

দেশের যা অবস্থা তাতে সরকারী উদ্যোগে তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব-নির্ভর না-হলে দেশের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

নতুন সরকারি কোম্পানিতে যোগ দিয়ে সুদর্শন সমবেত অফিসারদের বলেছিলেন, "বন্ধুগণ, এক প্রখ্যাত অভিনেত্রী কোনো একদিন বার্নার্ড শ'কে বলেছিলেন, তোমার বুদ্ধি আমার সৌন্দর্য মিলে যদি আমাদের একটি সন্তান হয়। বার্নার্ড শ' উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু যদি উল্টো হয়—তোমার বুদ্ধি এবং আমার সৌন্দর্য পায় সেই সন্তানটি? রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদারতার সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিপুণতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে এই পাবলিক সেকটর তৈরি হবে, এমন স্বপ্ন একদিন আমাদের দেশের কর্ণধাররা দেখেছিলেন। কিন্তু বন্ধুগণ, ঠিক তার উল্টো হয়েছে। সরকারী শ্লথ গতির সঙ্গে বেসরকারী দায়িত্বহীনতা মিশিয়ে ভারতবর্ষে আমরা এমন কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি—যা আমাদের এই দরিদ্র দেশের পক্ষে মোটেই শোভন নয়।"

সুদর্শন চৌধুরীর এই ধরনের চিন্তাধারা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধেও প্রতিফলিত হয়েছিল—পারমিতা সেগুলো ইতিমধ্যেই ফাইলে পড়ে ফেলেছে। সুদর্শন চৌধুরীর সম্বন্ধে তার মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে।

সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "কালিকাপুরে বেশ ছিলাম—রাজনীতি এবং শ্রমিক অশান্তির ধুয়ো তুলে কালিকাপুর ইন্ডাস্ট্রিকে দিল্লীর কিছু কর্তাব্যক্তি মারতে বসেছিলেন। আমি নিজেও প্রথমে ওখানে গিয়ে হতাশ হয়েছিলাম। সব কিছু যেন কালিকাপুরে বিষাক্ত আবহাওয়ায় গোলমাল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটু ভেবে আমার মনে হলো, 'এটাও একটা ম্যানেজমেন্ট চ্যালেঞ্জ। সরকার বহু বছর ধরে ভূমি রাজস্ব আদায় করেছেন, পোস্টাপিস চালিয়েছেন, চোর ধরেছেন এবং বিদেশী শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষা করেছেন। হঠাৎ তাঁরা নতুন উদ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যে নামলেন। কিন্তু তাদের কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচার নেই।"

"কেন রেল?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো। "অনেকদিন ধরে তো তাঁরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলপথ চালাচ্ছেন।"

পারমিতার প্রশ্নে বেশ খুশী হলেন সুদর্শন চৌধুরী। "ঠিকই বলেছো।

তুমি দেখবে প্রথম দিকে বড় বড় সরকারী ইন্ডাস্ট্রিতে সরকার রেলের লোকেদের বড় বড় দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, একমাত্র জাপান ছাড়া পৃথিবীর কোথাও রেলকে বিচক্ষণ ম্যানেজমেন্টের দূরদৃষ্টিতে চালানো হয়নি। এদেশের ওঁরা একটু সেকেলেপন্থী। রেলের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার এবং চীফ ইনজিনিয়াররা নতুন নতুন সরকারী কোম্পানিতে বসে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলেন। এই সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উচিত ছিল নিজেদের অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহস নিয়ে সরকারী উদ্যোগকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা। কিন্তু তাঁরা তা করলেন না, বরং অনেকেই মনে মনে চাইলেন সরকারী এই শিশু আঁতুড়ঘরেই নিপাত যাক—তাহলে প্রাইভেট সেকটরের সুবিধা হবে।"

পারমিতা হাসলো। সুদর্শন বললেন, "জাপানে কিন্তু কখনও এরকম ঘটনা ঘটতে পারতো না। সেখানে অন্য সবার মতো বিজনেসম্যানদেরও প্রচণ্ড দেশাত্মবোধ আছে। আমাদের এখানে যাঁরা শিল্পপতি হন তাঁরা হয় বিদেশী, না-হয় নিজের এবং নিজের গাঁয়ের লোকের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না।"

সুদর্শন চৌধুরীর মুখেই পারমিতা এর পরের ঘটনা শুনেছিল। কালিকাপুরে কিছুটা উন্নতি করার পরেই একদিন দিল্লীতে ডাক পড়লো সুদর্শন চৌধুরীর। হ্যারিংটন ইন্ডিয়া লিমিটেডের অবস্থা সঙ্গীন। বিদেশী এই প্রতিষ্ঠান যতদিন বিদেশীদের অধীনে ছিল ততদিন যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শেষ সায়েব ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই প্রতিষ্ঠানকে সত্যিই ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর অগোচরে এই কোম্পানির শেয়ার নিয়ে সুদূর লন্ডনে এবং সুইজারল্যান্ডে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। এর পিছনে নাকি অদৃশ্য এক ক্যালকাটা শিল্পপতির হাত আছে। কোম্পানির মালিকানা পুরোপুরি করায়ত্ত করবার জন্যে গত দু'বছর ধরে তিনি এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নানা কসরত দেখাচ্ছেন। এবং সেই টানা-পোড়েনে হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। কোম্পানির উৎপাদন দ্রুত নেমে এসেছে, কারখানার যন্ত্রপাতি মোটেই রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি, শ্রমিকদের

মধ্যে নানা বিশৃঙখলা ও অসন্তোষ, ব্যাংকে প্রভূত দেনা, নগদ টাকা ছাড়া কেউ এঁদের মাল দিতে চাইছে না, অর্থভাণ্ডার শূন্য এবং কোম্পানির দরজা বন্ধ হবার পথে। যে রাজস্থানী কোটিপতি ব-কলমে তাঁরই একজন বন্ধুর বিরুদ্ধে এই কোম্পানির দায়িত্ব ভার নিয়ে দাবা খেলছেন কোম্পানি ডকে উঠলেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কারণ তিনি এখন অন্য এক কোম্পানির ফাটকায় মত্ত।

কোম্পানি বন্ধ হলে বহু লোকের চাকরি যাবে—পূর্ব ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। সব রকম খবরাখবর নিয়ে সরকার রুগ্ন এই প্রতিষ্ঠান হ্যারিংটন ইন্ডিয়াকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে চান না। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে দেশরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। সুতরাং তাঁরা ডিরেকটর বোর্ড বাতিল করে সুদর্শন চৌধুরীকে কাস্টডিয়ানের পদে বসালেন।

সুদর্শন চৌধুরী জানালেন, এও এক মজার ব্যাপার। প্রাইভেট ছেড়ে পাবলিক সেকটরে গেলাম, কিন্তু হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার এই জট ছাড়াতে পাকে চক্রে আমাকে প্রাইভেট সেকটরে ফিরে আসতে হলো। ওরা বলে কাস্টডিয়ান, আমি বলি হেড নার্স। সোনার কোম্পানিটাকে শুষে শুষে খেয়ে এরা প্রায় মেরে এনেছিল, একথাও শুনলো পারমিতা।

কিন্তু গত এক বছরে প্রায় অসাধ্য সাধন করতে চলেছেন সুদর্শন চৌধুরী। কারখানায় ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে এনেছেন, উৎপাদন বাড়িয়েছেন অনেকটা। কাস্টডিয়ান সুদর্শন চৌধুরী কয়েক মাস পরে কোম্পানির বোর্ড অফ মানেজমেন্টের চেয়ারম্যান হয়েছেন। অনেক জঞ্জাল সাফ করেছেন সুদর্শন চৌধুরী—কিন্তু এখনও দুর্নীতির ব্যাপারটা পুরো দূর করতে পারেননি।

সুদর্শন বললেন, "দুর্নীতি সংক্রান্ত ফাইলগুলো এবার থেকে তুমিই রাখবে। প্রোডাকশানটা আরও একটু বাড়িয়ে আমি ওদিকে এবার নজর দেবো। বেশ কয়েকটা রুই কাতলাকে আমি গোড়াতেই যেতে বাধ্য করেছি। এই অসময়ে কারুর চাকরি যাক আমি চাই না—কিন্তু সর্বনাশ সমুৎপন্নে কিছুটা কেটে বাদ না দিলেও সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ হতো।"

পারমিতা বুঝতে পারছে কী বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন সুদর্শন চৌধুরী। পারমিতার দিকে আরও কয়েকটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "তোমার অফিসের অভিজ্ঞতা নেই—কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। খোদ দিল্লীতে দেখে এলাম, প্রধানমন্ত্রী বড় বড় দায়িত্বের পদে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের এনে বসিয়ে দিচ্ছেন। তুমিও তাজা ফ্রেশ মন নিয়ে এসেছো—আমার কাজে তুমি সাহায্য করতে পারবে বলেই বিশ্বাস।"

"আমার যতখানি ক্ষমতা তা দিয়ে চেষ্টা করবো, মিস্টার চৌধুরী," পারমিতা মাথা নিচু করে বললো।

সুদর্শনের চুরুটটা নিভে গিয়েছে। আর একবার লাইটার জ্বালিয়ে সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার কেসটা আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। তাছাড়া আমি ভুলতে পারি না, আট হাজার লোক এই কোম্পানিতে চাকরি করে। আজকের এই দুর্দিনে আট হাজার পরিবারকে আমি বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না।"

পারমিতার বাবাও সারাজীবন প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেছেন। কিন্তু লোভ ও স্বার্থপরতার বাইরে সেখানেও যে আদর্শ আছে, মানুষের জন্যে এতো ভালবাসা আছে, তা সে তো জানতো না।

চুরুটে একটা টান দিয়ে সুদর্শন বললেন, "এই অফিসের তুমিই প্রথম মেয়ে-অফিসার। মেয়েদের দিয়ে অফিসের কাজ হয় না যারা বলে, আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। নতুন যুগের মেয়েরা সুযোগ পেলে ছেলেদের থেকে অনেক ভাল কাজ করতে পারে এইটাই তুমি দেখিয়ে দাও।"

সুদর্শন চৌধুরী এরপর অফিসের খুঁটিনাটি বিষয়ে পারমিতার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, এই প্রতিষ্ঠানের সবাইকে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চান, কিন্তু পুরোপুরি নির্ভর করবার মতো লোক এখনও খুঁজে পাননি বলেই তিনি বাইরে থেকে নতুন স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট নিয়ে এলেন।

"কী রকম বুঝছেন দাদা?" টিফিন টাইমের আড্ডায় অনাদিবাবুকে হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার বাবুরা প্রশ্ন করলেন। নতুন লেডি-অফিসার সম্বন্ধে এই অফিসে এখন রীতিমত কৌতূহল।

পরোটার মধ্যে আলুচচ্চড়ি পুরতে পুরতে পাণ্ডবেশ্বরবাবু বললেন, "এ সব হলো শো। অফিসের শো বাড়াবার জন্যে দু' একজন লেডি না রাখলে আজকাল ভাল দেখায় না।"

ভোলানাথবাবু বললেন, "কত হাতি গেলো তল, এখন মশা বলে কত জল! রাজজ্যোতিষী হরকিঙ্করবাবুকে দিয়ে কোম্পানির কোষ্ঠী দেখিয়েছে ইউনিয়ন। অধীরই বলুক না কেন।"

কোম্পানির কোষ্ঠী! তাও কিনা ইউনিয়ন বিচার করিয়েছে জ্যোতিষীকে দিয়ে! আড্ডায় বেশ সাড়া পড়ে গেলো। অধীর চাটুজ্যে ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রেখেছিলেন—কিন্তু ভোলানাথবাবু ফাঁস করে দেওয়ায় একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। অধীর বললেন, "ইউনিয়নের ফাণ্ড থেকে টাকা খরচ করিনি। নিজের গাঁট থেকেই পনেরো টাকা জ্যোতিষীকে দিয়েছি।" কোম্পানির জন্মলগ্ন ইত্যাদি বিচার করে হরকিঙ্করবাবু বললেন, "এখন শনির বাঁকা দৃষ্টি রয়েছে কোম্পানির ওপর! ম্লেচ্ছ সংসর্গেই এই কোম্পানির উন্নতি—এখন ম্লেচ্ছ না থাকলে সময় ভাল চলবে না। সুতরাং মেয়েমানুষ এই ডুবো নৌকা তুলবে কী করে?"

"তা হলে জ্যোতিষী বলছে, সায়েবদের না তাড়িয়ে, তাদের হাতে আবার কোম্পানি তুলে দিলে কোষ্ঠীর দিক দিয়ে ভাল হতো?" পাণ্ডবেশ্বরবাবু প্রশ্ন করলেন।

"রাজজ্যোতিষী তো সেই রকমই ইঙ্গিত দিলেন।"

অনাদিবাবু বললেন, "সায়েবদের আর তাড়ালো কে ? তারা নিজেরাই তো গোপনে কোম্পানি বেচে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলো।"

অধীর বললেন, "সেটাই তো ট্রাজেডি। নৌকোর হাল ছিল কিপিং সাহেবের ওপর—কাজের লোক এবং ভাল লোক। অথচ নৌকোর মালিক হলেন বিলেতের অনারেবল মিস প্যাট্রিসিয়া ফক্স—কাকার মৃত্যুর পরে সব প্রপার্টি ওই বাইশ বছরের ছুঁড়ি পেলো। সেই বাইশ বছরের কচি মেয়ে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না—তাকে গিয়ে মিস্টার পোদ্দারের লোক গোপনে বোঝালো যে ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ কেরোসিন। ভবিষ্যতে সব ব্যবসাবাণিজ্য জোর করে গভরমেন্ট নিয়ে নেবে। যদি বুদ্ধিমতী হও তো এখনই হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার শেয়ার বেচে বেরিয়ে যাও। অনারেবল মিস ফক্সের কাঁচা টাকার দরকার ছিল কাকার ডেথ ডিউটি দেবার জন্যে—ভদ্রমহিলা ভাবলে যদি সম্পত্তি কিছু বেচতে হয়, তা হলে হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার কিছু শেয়ার বিক্রি হোক। ভোগীলাল পোদ্দার যখন বেনামে কিছু শেয়ার কিনতে আরম্ভ করেছে সুইস-ব্যাঙ্কে রাখা টাকায়, তখনই তো খাণ্ডেলওয়ালাজীর টনক নড়লো। মিস্টার ফকিরচাঁদ খাণ্ডেলওয়ালা অনেকদিন থেকে এই কোম্পানির তিন আনা শেয়ারের মালিক। ওঁর ইচ্ছে ছিল, মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে জামাইকে একটা কোম্পানি কিনে দেবেন। পোদ্দারের গোপন কাণ্ডকারখানার খবর পেয়ে উনি আবার অনারেবল মিস ফক্সের কাছে লোক পাঠালেন। বললেন, পোদ্দার তোমাকে কম দাম দিয়ে ঠকাবার তালে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকখানি এগিয়ে ছিল। পোদ্দারকে আটকানো শক্ত দেখে, খাণ্ডেলওয়ালাজীর দিল্লী এজেন্ট খবরের কাগজের টনক নড়িয়ে দিলেন। এদিকে কিপিং সায়েব কিছুই জানতেন না—সাপে-নেউলে যুদ্ধ ঠেকাতে গিয়ে তাঁকে পাততাড়ি গোটাতে হলো। পোদ্দারের শিখণ্ডী হরগোবিন্দ বসাক সুইজারল্যান্ড থেকে উড়ে এসে বোর্ডে জুড়ে বসলেন। কোম্পানির বারোটা যখন প্রায় বেজে এসেছে, তখন সরকারের টনক নড়লো। মিস্টার চৌধুরী সরকারী প্রতিনিধি হয়ে কোম্পানিতে এলেন। আর তিন দিন দেরি হলে হরগোবিন্দ

বসাক কারখানার অনেকগুলো দামী মেশিন হরণ করে বেচে দিতো।"

পাণ্ডবেশ্বরবাবু বললেন, "ওই সব শুনে শুনে কান পচে যাবার দাখিল হয়েছে। রাতে শুয়ে শুয়ে পোদ্দারজী, হরগোবিন্দ বসাক, খাণ্ডেলওয়ালা এমনকি তাঁর মেয়ে-জামাইকেও স্বপ্ন দেখি। এখন অনাদিবাবুর রিপোর্ট নেওয়া যাক।"

অনাদিবাবু বললেন, "গিন্নীকে বলছিলাম, তোমাদের পরবর্তী সংশোধিত সংস্করণে মেয়ে জাতটার অনেক উন্নতি হয়েছে। গিন্নী ফোঁস করে উঠলেন, কিন্তু আমাকে ট্রু ফ্যাক্ট যা তাই বলতে হলো।"

অধীরবাবু আবার বলতে গেলেন, "ফ্যাক্ট মানে ট্রু—সুতরাং ট্রু ফ্যাক্ট কথাটাই ভুল।"

"রাখো তোমার গ্রামার!" সবাই এক সঙ্গে অধীরবাবুকে বকুনি লাগালো। "উইদাউট অ্যাডজেকটিভ এবং সার্টিফিকেট ছাড়া ইণ্ডিয়াতে কোনো জিনিস চলে না—দেখছো না এদেশে বলছে পিওর ঘি, খাঁটি সরিষার তৈল, ট্রু কপি।"

পারমিতা সম্বন্ধে অনাদিবাবু বললেন, "এই মেয়ের যেমন মাথা, নজর তেমন চটপটে। মাত্র ক'সপ্তাহে চেয়ারম্যান সায়েবকে পুরো কব্জা করে ফেলেছে। আমার তো নিজের ওয়াইফকে দেখে কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, মেয়েরা কখনও মনস্থির করতে পারে না—দোকানে গিয়ে একবার ভাবে এই শাড়িটা কিনবো তার পরের মুহূর্তে বলে ওইটা নেবো। কিন্তু চেয়ারম্যানের স্পেশাল অ্যাসিসট্যান্ট ফাইল পড়েই চটপট মনস্থির করে ফেলে। কোনো ন্যাকামো নেই, ধানাইপানাই নেই—ফার্স্ট ক্লাস ইংরিজিতে ঝটপট লিখে ফেলে।"

"নিজের মেমসায়েব বলে অতো মাথায় তুলবেন না, অনাদিদা," মন্তব্য করলেন আর-এক স্টেনো নটরাজন।

অনাদিবাবু বললেন, "কোনো শালার দিব্যি বলছি—এই রকম ডিকটেশন নেওয়া ভুলেই গিয়েছিলাম। একদম কুঁতোয় না—মুখ দিয়ে যা বেরোলো তাই ফাইন্যাল। কখনও জিজ্ঞেস করে না—পড়ুন তো

কি বলেছি আগে। আজই তো মাইরি, ডিকটেশনের মধ্যেই এক টেলিফোন এলো—কোনো ফ্রেন্ড-ট্রেন্ড হবে। তিন মিনিট তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করলো মিস মুখার্জি। কিন্তু তারপরেই ফোন নামিয়ে সেনটেন্সের মাঝখান থেকে আবার ডিকটেশন শুরু করলো—আমি তো তাজ্জব।"

"বড়লোকের মেয়ে নিশ্চয়—ছোটবেলায় বাপ-মা ঘি-দুধ খাইয়েছে।" মন্তব্য করলেন পাণ্ডবেশ্বরবাবু। "ব্রেনের উপর ঘি-দুধের খুব এফেক্ট আছে এ-কথা আমি খোদ সুনীতি চাটুজ্যের মুখে শুনেছি।"

"ওসব জানি না, ভাই। খুব বড়লোকের মেয়ে হলে চাকরি করতে আসবে কেন?" অনাদিবাবু বললেন।

"চাকরিটা আজকাল হাই ফ্যামিলির মেয়েদের ফ্যাসান! বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চয় কোনো সুবিধে হয়," আন্দাজ করলেন পাণ্ডবেশ্বরবাবু।

অনাদিবাবু বললেন, "বেতার শিল্পী হলে. হুট্ করে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়—একটু রং ময়লা হলেও অসুবিধে হয় না। আমার বুড়িটাকে তাই রেডিয়োতে ঢোকাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি। কিন্তু চাকরির ব্যাপারটা তো জানি না।"

আরও প্রশ্নের উত্তরে অনাদিবাবু বললেন, "এক ফোঁটা মেয়ে হলে কী হয়—ভীষণ গম্ভীর। ব্যক্তিত্ব খুব। একটাও বাড়তি কথা বলে না। নিজের কোনো পার্সোনাল কাজও করায় না। মাঝে-মাঝে শুধু নিজের হাতে লেখা চিঠি ফেলতে দেয়। বিহারের কোনো টাউনে বাবা-মা থাকেন মনে হয়। আর এখানে কোম্পানির ফ্ল্যাট না দিয়ে এখনও আছে লেডিজ হোস্টেলে। সেটাও জানতে পারতাম না, কিন্তু টেলিফোনের জন্যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হলো। কাস্টোডিয়ান বলছেন, একটা টেলিফোন ইমিডিয়েটলি ওখানে ট্রান্সফার করিয়ে দিতে।"

টিফিন টাইমের আলোচনায় একটু ব্যাঘাত হলো। কারণ খোদ পারমিতা মুখার্জিকে হল্-এর মধ্য দিয়ে টয়লেটে যেতে দেখা গেলো। পারমিতাকে দেখতে পাওয়া মানেই টিফিন টাইম শেষ হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে। পারমিতা আজকাল লাঞ্চের সময় বেরোয় না।

ক্যানটিন থেকে কিছু খাবার আনিয়ে নেয়। তারপর চটপট খাওয়া শেষ করে, বই খুলে বসে।

নিজের সীটে ফিরবার আগে অনাদিবাবু বললেন, "বইও পড়তে পারে বটে আমার মেমসাহেব। মোটাসোটা গল্পের বই, দেড়দিন দু'দিনে শেষ করে দেয়।"

পাণ্ডবেশ্বরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠবার সময় বললেন, "অনাদি, তুমি যতই বলো ভাই, নারীবুদ্ধি ভয়ঙ্করী। বাড়িতে মেয়েমানুষকে মাথায় করে রেখে দাও, কিন্তু অফিসে, আউটসাইড ওয়ার্লডে মেয়েদের প্রশ্রয় দেওয়ার কথা শাস্ত্রে কোথাও বলেনি। এর ফল কখনও ভাল হতে পারে না।"

লেডিজ হোস্টেলের মেয়েগুলোর অফিসের কাজে মোটেই মন নেই। অফিসের কয়েকটা ফাইল হাতে পারমিতাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মাধবী ত্রিবেদী অবাক হয়ে গেলো। মাধবীর সঙ্গে পারমিতার আজকাল বেশ ভাব।

পারমিতার হাত চেপে ধরে মাধবী বললো, "অফিসকেই ধ্যান জ্ঞান করলে নাকি, মিতা?"

"অফিসের কাজকর্ম করতে হবে না?" পারমিতা হেসে প্রশ্ন করলো।

"মেয়েদের ধ্যান-জ্ঞানের আরও অনেক সাবজেক্ট আছে। তোমার মতো অফিস-পাগলা মেয়ে মানুষ কলকাতা শহরে কেউ কখনও দেখেনি।"

"এই জন্যেই তো কেউ মেয়েদের অফিসে দায়িত্ব দিতে চায় না," পারমিতা চোখ-দুটো বড় বড় করলো।

"মাথায় থাক দায়িত্ব বাবা! আজ আমাকে অফিস আওয়ারের পরে

একটু থেকে যেতে বললে—কী একটা জরুরী কনফারেন্স শুরু হবে। আমি স্রেফ বলে দিলাম, ভীষণ মাথা ধরেছে।"

"থাকতেই পারতে," পারমিতা বললে।

"আমি কি করে থাকবো? আগে থেকে ঠিক করা আছে। আমার উনিটি ঠিক সাড়ে-ছ'টার সময় এখানে এসে আমাকে তুলে নেবেন।"

"উনিটির না-হয় একদিন একটু কষ্ট হতো," পারমিতা রসিকতা করলো।

"তুমি কার কথা ভাবছো? রাজেশ চোপরার কথা? যে ফিয়েট গাড়ি নিয়ে নিচেয় দাঁড়াতো? তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছি। ছোকরা মোটেই সুবিধের নয়। ওর ধারণা মেয়েরা বুঝি খুব সস্তা। একদিন আমাকে রেস্তোরাঁয় খাইয়েই ছুঁক ছুঁক করছে—ফেভারের জন্যে।"

"ফেভার?" পারমিতা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

"ফেভার বোঝো না? একলা কলকাতা শহরে আছো, কীরকম মেয়েমানুষ তুমি।" মাধবী এবার পারমিতার চিবুকটা নেড়ে দিলো।

তারপর পারমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মাধবী বললো, "আমাদের অফিসের সুনন্দা বলে, কমবয়সী মেয়েমানুষ হলো রসগোল্লার মতো—যেখানেই রাখবে সেখানেই পিঁপড়ে ধরবে!"

তাড়াতাড়ি চা খেয়ে একটু কাজ করবে ভেবেছিল পারমিতা। কিন্তু মাধবী ছাড়লো না। ওর সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলো। বললো, "আজকে কিছুতেই তোমাকে কাজ করতে দেবো না। আমার সঙ্গে গল্প করবে।"

"গল্প করার লোক তো এখনই আসছে তোমার!" পারমিতা রসিকতা করলো।

"আসছে না। যার জন্যে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে চলে এলুম, তিনিই দারোয়ানের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন—আজ আসতে পারবেন না। শরীর খারাপ।"

অনিমাদি এক সহকর্মিণীর বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। ওদের আজ বিবাহবার্ষিকী—সেই উপলক্ষে কিছু খাওয়া-দাওয়া আছে। মাধবী ঘরে

ঢুকে অণিমাদির খাটে বসলো। পারমিতা বললো, "প্রত্যেকদিন সন্ধের সময় এমন টো টো করে ঘুরে না বেড়িয়ে নিজের উন্নতি করবার চেষ্টা করলে পারো।"

"রাখো তোমার উন্নতি। উন্নতি মানে তুমি তো বলছো, রাত্রে পড়ে বি-এ পরীক্ষায় বসা, কিংবা সেক্রেটারিয়াল কোর্স নেওয়া। ওসব আমার ভাল লাগে না। মেয়েদের উন্নতি ওইভাবে হয় না—সবে গাঁ থেকে কলকাতায় এসেছো, এখনও খবর রাখো না, পরে বুঝবে।"

মাধবী একটু একরোখা আছে। সে বললো, "মেয়েদের প্রগনসিস হলো—ওয়ানস এ উয়োম্যান অলওয়েজ এ উয়োম্যান। মেয়েদের আবার উন্নতি কী? মেয়ে হয়ে জন্মেছো যখন তখন মেয়ে হয়েই শেষ হতে হবে।"

মাধবী জানালো, তার ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগে। সবাই তো অণিমাদি নয় যে অজস্র মেয়ে-বান্ধবী আছে—আজ এ-বাড়ি, কাল ও-বাড়িতে নেমন্তন্ন লেগেই আছে। লেডিজ হোস্টেলের নিঃসঙ্গ আইবুড়ো মেয়েদের কে রোজ রোজ বাড়িতে ইনভাইট করবে? মাধবী তাই আউটডোর লাইফ পছন্দ করে।

"আউটডোর লাইফ বলতে তুমি কী বোঝো মাধবী?" পারমিতা প্রশ্ন করে।

"অফিসের এ্যাটমসফিয়ারে ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। হোস্টেলে এনে কথা বলবো, তার উপায় নেই। এমন মান্ধাতার আমলের নিয়ম যে নিজের বাবাকেও ঘরের ভিতর ঢুকতে দেবে না। তাই ছেলেদের সঙ্গে বাইরে-বাইরে—হয় গাড়িতে না-হয় স্কুটারে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।

একটু থেমে সিগারেট ধরালো মাধবী। "ট্রাই করে দ্যাখো না একটা পারমিতা। একটা সিগারেট খেলে কিছু অসতী বনে যাবে না। আজকাল হাজার হাজার মেয়ে সিগারেট খাচ্ছে—তাদের স্বামীরা খাতির করে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে। না-হলে আমাদের হিন্দুস্থান সিগারেট কোম্পানির

এতো সিগারেট যাচ্ছে কোথায় ?"

পারমিতা বললো, "আমি ভাবছি তোমার গার্জেনকে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেবো—মাধবীকে একটু কনট্রোল করুন। ওকে একলা ছেড়ে না দিয়ে কাছে কাছে রাখুন।"

"সে গুড়ে বালি !" খিলখিল করে হেসে উঠলো মাধবী। "আমার বাবাও নেই। মাও নেই। দাদা এক আছে, সে আমার সামনে মুখ তুলে কথা বলবার অবস্থা রাখেনি। আর এখানকার খাতায় যার নাম লেখা আছে, তিনি আমার ডিসট্যান্ট মেসোমশাই—মাধবী রইলো কি গেলো তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না।"

অণিমাদির বিছানায় শুয়ে মাধবী জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি পুরুষমানুষ সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ নেই ? এই ক'মাসে একটা ছোঁড়াকেও তো পাত্তা দিতে দেখলাম না। কমবয়সী পুরুষমানুষদের আমার খুউব ভাল লাগে। বিশেষ করে ওদের বুকের মধ্যে ছটফটানি জাগিয়ে দিতে আমার প্রচণ্ড মজা লাগে। কিন্তু....."

"কিন্তু কী ?" পারমিতা জিজ্ঞেস করে।

"ছেলেরা বড় অধৈর্য হয়। সব শিয়ালের এক রা। একটু আস্কারা দিয়েছো তো সঙ্গে সঙ্গে নিজ মূর্তি ধারণ করবে। অথচ আমিও পণ করে বসে আছি, যে আমার সঙ্গে হ্যাংলামো করবে তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।"

"মেয়ে হবার অনেক অসুবিধে তাই না ?" পারমিতা চায়ের কাপে মুখ দিয়ে মাধবীকে জিজ্ঞেস করে।

"অসুবিধে বলে অসুবিধে—ভগবান ব্যাটাছেলে সৃষ্টির যত ঝামেলা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন।"

"মেয়েরা নিজেদের ছোট ভাবলেই ছোট হয়ে যাবে। না-হলে তারা ছোট কোন কারণে ? আমি তো অফিসে ডজন ডজন ছেলেকে ঠিক ডিসিপ্লিনে রেখেছি। তাদের থেকে কাজ আমি কম পাই না।"

মাধবী বললো, "তোমার আর কী পারমিতা। তুমি দেখতে শুনতে

ভাল, পড়াশোনায় ভাল, চাকরীতে ভাল, তোমার মনোবল আছে—যখন খুশী বিয়ে করে বরের ঘরে কেটে পড়তে পারো।"

হাসলো পারমিতা। "বর আর ঘর করে করেই আমাদের দেশের মেয়েগুলো গেলো। কই ছেলেরা তো বউ আর বাড়ির জন্যে এইভাবে মাথা ঘামায় না।"

মাধবী বললো, "মেয়েরা যদি সবাই তোমার মতো হতে পারতো। ওই তো অণিমাদি—বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয় বলে, বিয়েই করতে পারলো না। বান্ধবীদের বিবাহবার্ষিকী, আর না হয় তাদের ছেলেদের জন্ম দিবস লেগেই আছে। মুখে হাসি ফুটিয়ে হাতে ফুলের গোছা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে অণিমাদি বান্ধবীদের বাড়িতে যাচ্ছে—তারপর ফিরে এসে স্লিপিং পিল খাচ্ছে। বিয়ে করবার ইচ্ছে মজ্জায়-মজ্জায়—কিন্তু যেহেতু মেয়ে হয়ে জন্মেছে, বিয়ে হলেই স্বামীর প্রাইভেট প্রপার্টি হয়ে যাবে। তখন হয়তো স্ত্রীর রোজগারের টাকা বাপের বাড়িতে পাঠাতেই দেবে না। অণিমাদির ছোট ভাইয়ের এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে আট বছর বাকি—ততদিন বিয়ের বাজারে অণিমাদির কোনো দামই থাকবে না। অণিমাদি তখন শাড়িটাড়ি পরে সেজেগুজে বান্ধবীদের মেয়ের বিয়ে অ্যাটেন্ড করবে!"

এসব কথা অণিমাদি কখনও তো পারমিতাকে বলেনি। মাধবী বললো, "বলবে কী? মুখ দেখে বুঝতে পারো না? এমনি মুখ খুলতে চায় না, আমিই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি।"

"অথচ এই অণিমাদি জীবনটা এনজয় করবে না।" মাধবী অভিযোগ করলো।

"এনজয় কথাটা বড়ো গোলমেলে কথা মাধবী," পারমিতা বললো।

"মোটেই গোলমেলে কথা নয়—এনজয় মানে উপভোগ করা। প্রাণ যা চায়, মন যা চায়, দেহ যা চায় তাই করে ফেলো। প্রতি পদে পদে এই যে চেপে থাকার শিক্ষা মায়েরা নিজেদের মেয়ের ওপর চাপিয়ে দেন, এর কোনো মানে বুঝি না আমি। আমার মা অনেক ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন। আমার তাই সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। আমার খানিকটা

একা থাকবার শিক্ষা হয়েছিল--কিন্তু এই বড় হয়ে দেখছি, একা থাকতে ভাল লাগে না। আর তাছাড়া....."

"তাছাড়া কি।" মাধবীর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"তাছাড়া বিরাট এই শহরে, মেয়েদের একা থাকার মতো ব্যবস্থা কিছুই করা হয়নি। যেসব মেয়ে নিজের আগুনে জ্বলছে, তারা যদি সংসারের মধ্যে থাকে তবেই বাঁচোয়া। আমাদের মতো লেডিজ হোস্টেলের মেয়েদের জন্যে এই শহরটা তৈরি হয়নি, এ কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।"

"ছেলেদের সঙ্গে এই যে একলা-একলা ঘোরো—এর জন্যে তোমার ভয় করে না?" পারমিতা জিজ্ঞেস করে মাধবীকে।

"দূর! সঙ্গে যা রাখি, তোমাকেও একটা প্রেজেন্ট করব।" এই বলে মাধবী নিজের ঘরে চলে গেলো। নিজের হাতব্যাগটা সঙ্গে নিয়ে ফিরলো। "এই যে ব্যাগটা দেখছো এর মধ্যে মেক আপ ফাউন্ডেশন, ডিঅডোরেন্ট, লিপস্টিক, নেলপালিশ এবং পাউডার ছাড়াও এই জিনিসটা আছে"—বলে মাধবী জিনিসটা বার করে দেখালো। পারমিতা অবাক হয়ে দেখলো মাধবীর হাতে একখানা চকচকে ছুরি।

মাধবী কিছুতেই শুনলো না, ছুরিটা পারমিতাকে উপহার দিলো। বললো, "আমার প্রত্যেক গার্ল ফ্রেন্ডকে সুযোগ পেলেই আমি এই ছুরি উপহার দিই। কলকাতা শহর মেয়েদের পক্ষে বড় খারাপ জায়গা—আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।"

মাধবীর কাছে ছুরিটা নিতেই হলো। পারমিতার হাতব্যাগে ছুরিটা পুরে দিতে দিতে মাধবী বললো, "বান্ধবীদের ছুরি উপহার দেওয়াটা আমার হবি। তুমি এ-নিয়ে ভেবো না।"

ঘর থেকে যাবার আগে মাধবী আর এক কাণ্ড করে বসলো। পারমিতার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বললো, "ভগবান তোমাকে কী জিনিস তৈরি করেছে বলো তো? দেখতে নরম পুতুলের মতো মনে

হয়, কিন্তু ভিতরে একবারে ধারালো ইস্পাত। পেট থেকে পড়েই তুমি এ রকম? না নিজেকে এইভাবে তৈরি করেছো?"

পারমিতা আবার মিষ্টি হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। কারখানায় নতুন মেশিন বসানোর লোন অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট দুখানা খসড়া পাঠিয়েছে। মিস্টার চৌধুরী চান ব্যাংকের কাছে চিঠি দুটো সুন্দরভাবে লিখতে। ফাইল দুটো পারমিতার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "পরিষ্কার ঝরঝরে ইংরেজি পড়ে ধার দিয়ে দেবার পাত্র ব্যাংকাররা নয়—তবু আমি চাই কোম্পানির এফিসিয়েনসির ছাপ তার চিঠিপত্রেও থাকুক। চিঠিটা পড়েই যেন ব্যাংক বুঝতে পারে এ-অফিসে কিছু কাজের লোক আছে।"

এ ধরনের চিঠির ড্রাফট পারমিতা বেশ ভালভাবেই করে। এই ক'মাসে কতকগুলো বড় বড় নোট তৈরি করে নিজের ওপর পারমিতার বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে। আজও ফাইলটা খুলে পারমিতা কাজ আরম্ভ করবে ভাবছিল। কিন্তু মাধবীর শেষ প্রশ্নটা পারমিতাকে নাড়া দিয়ে গেলো।

স্নানের পরে গায়ে পাউডার ছড়াতে ভুলে গিয়েছিল পারমিতা। গোলাপী রংয়ের হাউস কোটটা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পারমিতা শরীরে একটু পাউডার ছড়িয়ে নিলো। তারপর চশমার বাক্স থেকে চশমা খুলে পরলো সে। সামনের চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। চিরুনি দিয়ে সেগুলোকে সাময়িকভাবে শাসন করে নিলো পারমিতা।

তারপর রবারের স্লিপার সমেত ডান-পা সামনের টেবিলে তুলে দিলো পারমিতা। সিলিং থেকে ঝোলানো লেডিজ হোস্টেলের বৃদ্ধ পাখাটা ধুঁকতে ধুঁকতে মাথার ওপর ঘুরছে—মাঝে মাঝে টং টং করে আওয়াজ তুলে বুড়োটা নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে! পাশের ঘরের মেয়েরা সজোরে চটুল ইংরেজি সুরের গ্রামোফোন রেকর্ড চালিয়ে দিয়েছে। কয়েকজন মেয়ে ওই সুরের সঙ্গে নাচ প্র্যাকটিস করছে। অমৃতা প্রীতমের বয়ফ্রেন্ড গতকালই ওর জন্মদিনে এই রেকর্ড-প্লেয়ারটা উপহার দিয়েছে।

প্রতিভা কাপুর রসিকতা করে বলেছে, "ছোকরা এই উপহারের শোধ সুদে আসলে তোর ওপর দিয়ে তুলবে।" এই কথায় অমৃতা বেশ রেগে গিয়েছিল, প্রতিভা কাপুরকে বলেছে "সেই সময় তোমাকে এগিয়ে দেবো—কারণ তুমি তো এই প্লেয়ারে ভাগ বসাচ্ছো।"

লেডিজ হোস্টেলের নিয়মকানুন বেশ কড়া। ঘরের মধ্যে এইভাবে উচ্চগ্রামে বাজনা বাজানো নিয়মমাফিক নয়। কিন্তু কে শুনছে সেসব কথা ? মিসেস ভায়োলেট খান্না মাঝে মাঝে ডিনার টেবিলে হাজির হয়ে নীতি উপদেশ দেন। কালো কালো হাত দুটো নেড়ে দাঁত বের করে বলেন, "আমি সবাইকে রিমাইন্ড করতে চাই যে তোমরা সবাই গ্রোন-আপ গার্ল। অ্যান্ড দিস ইজ এ সিটি। অ্যান্ড এ বিগ সিটি ইজ অলওয়েজ ডেনজারাস ফর কেয়ারলেস গ্রোন-আপ গার্লস।" মাধবী মন্তব্য করে, "কী মুশকিল বাবা, বড় শহরে গ্রোন-আপ বয়দের বুঝি কোনো দায়িত্ব নেই ? যত দোষ নন্দ ঘোষ—যত সাবধান মেয়েদেরই হতে হবে।"

জেনারেল টয়লেট থেকে হুইস্কির দুটো খালি বোতল উদ্ধার করে মিসেস ভায়োলেট খান্না কয়েকদিন আগে ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। মেয়েদের ডেকে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে যেতে চাও, তারা অবশ্যই সে-পথে যেতে পারো। আফটার অল তোমরা গ্রোন-আপ গার্লস। কিন্তু আমার অনুরোধ, তোমরা হোস্টেলের বাইরে সব কিছু করে এসো—আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের নাম ডুবিও না।"

কারা এই মেয়ে হোস্টেলে হুইস্কি এনেছে তা মিসেস খান্না খোঁজ করবার চেষ্টা করলেন না। মাধবী বলেছিল, "নিশ্চয়ই প্রতিভা কাপুরের কর্ম। মার্চেন্ট অফিসে সামান্য ক'টাকা মাইনে পায় ! কিন্তু যেভাবে টাকা উড়োয়, মনে হবে কাপুরথালার রাজকুমারী।"

বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে পারমিতা নিজের কথা ভাবছে। মাকে মাইনের টাকা পাঠিয়েছিল। মা আজ তার প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যবারের মতো এবারেও লিখেছেন, "তোমার টাকা পেলুম। কিন্তু মেয়ের রোজগারের টাকা বাবা-মায়ের জন্যে নয় শুনেছি। তুমি

বড়ো হয়েছো—কিন্তু তোমার জন্যে আমার চিন্তার অন্ত নেই। তোমার বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার ঝগড়া লেগেই আছে। তোমার বাবা আমার সঙ্গে তর্ক করে বলেছেন, মেয়ে এবং ছেলেদের মধ্যে কোনো তফাত নেই। আমাদের দেশে এখন তারা সমান হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যারা জাতে আলাদা তারা সমান হবে কী করে, আমি বুঝে উঠতে পারি না। তোমাকে ঘর-সংসারী দেখা ছাড়া এখন আমার ঠাকুরের কাছে আর কোনো প্রার্থনা নেই।"

বাবার মুখটা পারমিতা এই মুহূর্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বাবা কোনোদিন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য দেখেননি। বাবা কোনোদিন বেশি কথা বলেন না। কিন্তু রুবিদির ঘটনাটাই বাবাকে যেন পাল্টে দিলো। কলেজে পড়ার সময় রুবিদির যখন বিয়ের সম্বন্ধ এলো, তখন কেউ একবার রুবিদির সঙ্গে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন মনে করলো না। শৈলেনদার মতো অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে তাতেই সবাই উল্লসিত। রুবিদি তবু বোনের মাধ্যমে বলেছিল, তার পড়াশোনা করবার এবং বি এ পাস করবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু রুবিদির কথায় কেউ কান দিলো না। মা বললো, "পড়াশোনা করে তো কত সরোজিনী নাইডু হবে। বি এ, এম এ পাস করেও তো সেই বিয়ের বাজারে পাত্র খুঁজে মরতে হবে। এইরকম সম্বন্ধ রোজ রোজ আসবে না—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।"

বাবা শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, "পড়বার ইচ্ছে থাকলে বিয়ের পরেও পড়া যায়; বিহারের এই শীতলপুর টাউনে আজকাল কত মেয়েই তো সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে কলেজ যাচ্ছে।"

কিন্তু রুবিদির সেই সব ইচ্ছে কোথায় ভেসে গেলো। মেয়েরা এতোই অসহায় যে এক মাসের মধ্যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গর্ভে নবাগত এক জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে দিদি ফিরে এলো। জীবনের প্রধান দুটো ঘটনা, বিবাহ এবং গর্ভধারণ কেমন সহজে রুবিদির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো, বাবা-মা শৈলেনদা কেউ তার মতামতে কান দেওয়ার প্রয়োজন মনে

করলেন না।

পারমিতা তখনও ছোট। এতো চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা ছিল না। পৃথিবীতে মেয়েদের এমনিই হয়। জীবনের মালা এমনি করেই মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার খোঁজখবর না নিয়েই গাঁথা হয়ে থাকে এমন একটি ধারণা পারমিতার মনেও তৈরি হয়েছিল। মা আবার পারমিতার জন্যেও কোষ্ঠী দেখিয়েছিলেন। কোষ্ঠীর কোনো এক ইংগিত অনুযায়ী আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়বার আগেই জাতিকাকে পাত্রস্থ করবার পরামর্শ গণকঠাকুর দিয়েছিলেন। গ্রহনক্ষত্রের কুটিল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মেয়েকে মুক্ত করবার এই সুবর্ণ সুযোগ মা মোটেই হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না। রুবির অকালমৃত্যুর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাকি তার কোষ্ঠীতেই ছিল। ফলে মায়ের বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

বাড়ীতে গোপনে গোপনে যে পাত্র অনুসন্ধান চলেছে এ-খবরও স্কুল ফাইন্যালের ছাত্রী পারমিতার কানে এসেছে। বিয়ে সম্বন্ধে একটা অজানা রোমান্টিক কৌতূহল যে তখন পারমিতার ছিল না তেমন নয়। কিন্তু নিজের ইচ্ছে এবং নিজের পছন্দ মতো কিছু একটা করবার জেদও হয়েছে। রুবিদি চিরকাল বলে এসেছে, ফর্সা পুরুষমানুষ ছাড়া কাউকে সে বর হিসেবে পছন্দ করবে না, মোটা গোঁফ ছিল রুবিদির চক্ষুশূল। কিন্তু সেই রুবিদি কোনো আপত্তি না করে, সালঙ্কারা হয়ে কেমন সহজে আবলুস কাঠের মতো কালো স্বামীর গলায় সাদা ফুলের মালা পরিয়ে দিলো ; তার ওপর শৈলেনদার কি বিরাট গোঁফ। বিয়ের পরেও তো স্বামীকে পাল্টাতে পারেনি রুবিদি—তখনও শৈলেনদার বিরাট গোঁফ রয়ে গেলো।

কলকাতা থেকে একবার কারা পারমিতাকে দেখতে আসবে এমন কথা কানে গিয়েছিল। পারমিতা তখনও বড় নরম ছিল। ভয় হয়েছিল, দিদির মতোই সব সাধ-আহ্লাদ চেপে রেখে তাকেও ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তখন জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতার সুযোগ এসেছে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই রাত্রে শীতের কলকাতায়

অকালে বৃষ্টি এলো নাকি?

পারমিতা দেখলো সত্যি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। লেডিজ হোস্টেলের পঞ্চাশ বছরের দরজা জানলাকে অপমান করে বৃষ্টির ছাঁট ঘরের ভিতর এসে ঢুকছে। এমনি বৃষ্টিমুখর রাতের অন্ধকারে অতীতের স্মৃতি হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করে—এমনি রাতের এমনই ঘনঘোর বরষায় বোধহয় তার মনে পড়ে। বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া সেই মুখটা আবার পারমিতার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। দেবপ্রিয় রায় নামটা এতোদিন পরে আবার টুং টুং করে বড়লোকের বাড়ির ইমপোর্টেড কলিং বেলের মতো পারমিতার কানে বেজে উঠলো।

পারমিতাদের বাড়ির খুব কাছেই থাকতো দেবপ্রিয়র মামারা। দেবুর মুখটা দেখে সেই বয়সে পারমিতার যেন মনে হয়েছিল গ্রীক ভাস্কর্যের কোন এক মডেল। দেবপ্রিয় বেশ লম্বা ছিল—নাকটিও টিকালো, চোখ দুটো একটু কটা, চুলগুলো কোঁকড়ানো। কিন্তু গ্রীক ভাস্কর্যের মডেল ভেবে দেবপ্রিয়কে হৃদয়সিংহাসনে অমনভাবে বসিয়ে দেওয়াটা পারমিতার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হয়নি।

পারমিতার একটু হাসি এলো। তখন সে সত্যিই বোকা ছিল। কিন্তু কচি-কাঁচা বয়সের ওটাই বোধহয় মুশকিল। কৈশোর পেরিয়ে যুবতী হৃদয়ে যেমন একটা সিংহাসন পাতার জায়গা হলো, অমনি সেই শূন্য আসন পূর্ণ করবার জন্য ব্যস্ততা লেগে যায়। দোষটা পারমিতার একার নয়। দেবপ্রিয়র মামাতো বোন বুবুই প্রথম পারমিতাকে বলেছিল, "তুই কি আমার দাদাকে কোনো মন্তর দিয়েছিস?"

"মানে?" পারমিতা বেশ রেগে গিয়েছিল বুবুর ওপর।

"না-হলে দাদা তোর ফিগারের অমন প্রশংসা করলো কেন? দাদা বললো, 'বুবু, তোর যত বান্ধবী আছে তার মধ্যে ওই মেয়েটাই সবচেয়ে স্মার্ট।' ভারি সুন্দর একটা নাকি আলগা চটক আছে তোর!"

"তোর দাদা আমাকে দেখলো কোথায়?" পারমিতা জিজ্ঞেস করেছিল।

"কেন ? স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় দাদা রোজ যখন আমাকে পরীক্ষার হল থেকে আনতে যেতো।" তখন সত্যিই দঙ্গল বেঁধে বুবুর এ-পাড়ার বান্ধবীরা সবাই এক সঙ্গে ফিরতো।

"তোর দাদার খেয়ে-দেয়ে আর কোনো কাজ নেই বুঝি ? কোন মেয়ের কীরকম ফিগার তা পরীক্ষা করে দেখছে।"

বুবু আবার দেবপ্রিয়দার একজন ভক্ত। দাদা সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য তার ভাল লাগলো না। "ঠিক আছে ভাই, দাদাকে আমি তোর কথা বলে দেবো," বুবু ঠোঁট উল্টে উত্তর দিয়েছিল।

এবার পারমিতার লজ্জিত হবার পালা। "বারে ! দাদাকে রিপোর্ট করতে বললাম বুঝি ? আমি বলতে যাচ্ছিলাম তোমার দাদার জানা উচিত পরীক্ষার দুশ্চিন্তায় মেয়েদের শরীর আধখানা হয়ে যায়—এই সময় ফিগার যাচাই করা খুবই আনফেয়ার।"

কথাটা বুবুর মনে ধরেছিল। "পড়াশোনায় ভাল হলে কী হয়, দাদাটা আসলে কিছু জানে না।" তারপর দাঁতে নখ কেটে বুবু বলেছিল, "কিন্তু তুই তো কম বোকা নয়—তুই যে পয়েন্টটা তুললি, সেটা তোর পক্ষে গেলো না। পরীক্ষার দুশ্চিন্তা না থাকলে অন্য মেয়ের ফিগার হয়তো আরও ভাল দেখাতো—তুই দাদার নজরে পড়তিস না।"

এর পর একদিন দেবপ্রিয়র সঙ্গে পারমিতার আলাপ হয়েছিল। হাজার হোক, অনেক মেয়ের ভিড়ের মধ্যে যে তাকে আলাদা করে দেখেছে, নিজে থেকে স্বীকার করেছে তার দেহরেখা ভাল, তার সঙ্গে কার না একবার গল্প করতে ইচ্ছে হয় ? তাছাড়া, পারমিতা শুনেছিল, দেবপ্রিয় পড়াশোনায় খুব ভাল। অঙ্কে মাথাটা বেজায় পরিষ্কার। ওই বুবুটা অল্পবয়সেই বেশ পেকে গিয়েছিল। বলেছিল, "ফিগার-ওয়ার্কটা দাদা খুব ভাল বোঝে—তাই বোধহয় তোর ফিগারের দিকেও দাদার নজর পড়লো।"

দেবপ্রিয় তখন ভারি সুন্দর সুন্দর কথা বলতো। চোখা চোখা স্মার্ট ডায়ালগ ইনজিনীয়ারিং কলেজের বন্ধুদের কাছে শুনে আসতো। সেই

সব লাগাতো পারমিতার কাছে। পারমিতা তখনই দেবপ্রিয়র অ্যাডমায়ারার বনে গিয়েছিল।

শীতলপুর টাউন থেকে কয়েক মাইল দূরে ইনজিনীয়ারিং কলেজের হোস্টেলেই থাকতো দেবপ্রিয়। শনিবার দুপুরে সাইকেল চড়ে মামাবাড়ি আসতো দেবপ্রিয়। আসার পথে পারমিতাদের বাড়ির সামনে জোরে বেল বাজিয়ে দিতো—আর সেই আওয়াজ শুনেই পারমিতা বারান্দার দিকে ছুটে আসতো। এক একদিন সাইকেল থেকে নেমে পড়ে দেবপ্রিয় এমন ভান করতো যেন সাইকেলের চেন খুলে গিয়েছে। পারমিতাকে বারান্দায় আসতে দেখে কালো সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে মুখ টিপে হাসতো দেবপ্রিয়। ওর চোখ না দেখতে পেলেও, দেবপ্রিয়র চোখের ভাষা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হতো না পারমিতার।

এমনই একদিন কলকাতা থেকেই সেই বিখ্যাত পাত্র-পার্টি মেয়ে দেখবার জন্যে বাবার আমন্ত্রণে শীতলপুরে হাজির হলেন। সকালের ট্রেনে এসে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দলের তিনজনকেই ওদের বাড়িতে আতিথেয়তা নিতে হয়েছিল। সে এক মহা অস্বস্তিকর অবস্থা পারমিতার। খবরটা যাতে বুবুর কানে না যায়, তার জন্যে ঠাকুরের কাছে কতবার প্রার্থনা করেছে সে।

পাত্র, তার বাবা ও মা সারাদিন রাজকীয় আদর ভোগ করেছিলেন। বাবা অফিস না গিয়ে বাজারহাট করেছেন এবং পাত্রপক্ষের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করেছেন। রাজভোগের ডিশ থেকে মিষ্টি তুলে নিতে নিতে পাত্রের বাবা বলেছিলেন, "আপনার মেয়ের বয়স তো কম ; এখন থেকেই এতো চিন্তিত হচ্ছেন কেন?"

হাতজোড় করে পারমিতার বাবা বলেছেন, "মেয়েরা হচ্ছে চারাগাছের মতো—উৎপাটন করে আবার যখন পুনঃরোপণ করতেই হবে, তখন দেরী করে লাভ কী?"

দিনের মধ্যে বার কয়েক পারমিতাকে সিলেকশন কমিটির সামনে নানা কাজের অছিলায় উপস্থিত হতে হয়েছে। সাইকেল রিকশায় চড়িয়ে

বাবা যখন ওঁদের স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছেন, তখনও গেটের সামনে এসে নমস্কার করতে হয়েছে পারমিতাকে। সত্যি তখন কত নরম ছিল পারমিতা।

তারপর ঘণ্টাদেড়েক পরে বাবা মুখ গম্ভীর করে স্টেশন থেকে ফিরে এলেন। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু আন্দাজ পেলে ?"

ভদ্রলোক বেশি লৌকিকতার প্যাঁচ কষেননি। সোজাসুজি বলেই দিয়েছেন মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয়নি। মা বললেন, "মেয়ের রং যে খুব ফর্সা নয়, সে কথা জেনেই তো ওঁরা কলকাতা থেকে এসেছিলেন !" পাত্রের বাবা বলেছেন, "হুঁ। আমাদের ছেলে একটু ভাল ফিগার চায়। আজকালকার ছেলে, বুঝতেই পারছেন তো।"

ফিগার ! সেই ছেলেটার ফিগারের কথা পারমিতার এখনও মনে আছে। নাদুস-নুদুস—ল্যাকটোজেন বেবি মার্কা চেহারা, গালটা ফুলো ফুলো, ওই বয়সেই একটু ভুঁড়ি হয়েছে। সেও ফিগার চাইছে !

ফিগার কথাটা রাত্রে ঘুরে-ফিরে ঘুমের ঘোরে পারমিতার মনের মধ্যে আবার এসেছিল। আর প্রতিবার সাদা হাফশার্ট খাঁকি প্যান্ট পরা সাইকেল-চড়া এক যুবকের ছবি সে দেখতে পেয়েছে—যার চোখে কালো সানগ্লাস, মুখে মিষ্টি হাসি। পছন্দ না হওয়ার দুঃখ তো হলোই না, বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে পারমিতা। আর সেই সঙ্গে গভীর কৃতজ্ঞতা এসেছে সেই ছেলেটার ওপর যার নাম দেবপ্রিয়।

দেবপ্রিয়, প্রিয়, প্রিয়তম। কিন্তু এতোদিন পরে লেডিজ হোস্টেলের সিঙ্গল বেডে শুয়ে শুয়ে এসব কথা আবার রোমন্থন করবার চেষ্টা কেন করছো পারমিতা মুখার্জি ? সে অধ্যায় তো অনেক অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আপন ভাগ্যকে বুঝে নেবার চেষ্টায় বিহারের ক্ষুদে শহরের সাধারণ মেয়ে পারমিতা মুখার্জি তো অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছে। সেই শীতলপুর টাউন, ছোট কলেজ, সাইকেল রিকশা, লাল কাঁকরের পথ থেকে বিরাট এই শহর কলকাতা, বিবিডি বাগ, হ্যারিংটন

ইন্ডিয়া, রাসেল স্ট্রীট, লেডিজ হোস্টেল এ সব তো অনেক দূর। পারমিতা এখন নগর নন্দিনী, স্পেশাল অ্যাসিসট্যান্ট টু চেয়ারম্যান, হ্যারিংটন ইন্ডিয়া লিমিটেড অফিসে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ।

দরজায় টোকা পড়লো। এবং প্রায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন অণিমাদি। পিছনে মাধবী। অণিমাদি বিছানায় বসে পড়ে বললেন, "ফিরতে আরও অনেক দেরি হতো। কিন্তু সুলোচনার হাজবেন্ড শুনলো না, ওরা দুজনে ড্রাইভ করে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে গেলো। ম্যারেজ অ্যানিভারসারির রাতে কষ্ট করে আমাকে পৌঁছে দেওয়ার পিছনে স্যাক্রিফাইস আছে। বলো?"

"ওরা খুব হ্যাপি?" মাধবী বোকার মতো জিজ্ঞেস করলো।

চোখ দুটো বড় বড় করে অণিমাদি বললেন, "হ্যাপি না হলে, বিবাহ-বার্ষিকীতে এতো ঘটা করবে কেন?"

"জানো অণিমাদি, আমার যত বান্ধবী, তারা ভীষণ আনহ্যাপি। কেউ মনের মতো বর পাচ্ছে না। যারা বিয়ে করেছে, তারা বিয়ে রাখতে পারছে না। ছেলেগুলো আজকাল বউদের কাছে ইমপসিবল গুণ এক্সপেক্ট করে। তারা চায় রূপে শকুন্তলা, স্বভাবে সীতা, রান্নায় দ্রৌপদী, সেবায় ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এবং বিছানা প্রক্রিয়ায় উর্বশীর মতো এক্সপার্ট মহিলা—অল ইন ওয়ান।"

"থাম তুই। তোকে বলেছে." মাধবীকে বকুনি লাগালেন অণিমাদি। "ছেলেগুলো ঠিক আছে, বরং মেয়েরাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

মাধবী বললে, "তুমি যাই বলো, ইন্ডিয়াতে ছোঁড়াগুলো বেশ সুখে আছে। দুনিয়ার যত সুখ, সোসাইটি ওদের জন্যেই তুলে রেখেছে। বিয়ের মন্তর পড়লেই, বিনা মাইনের বাঁদি-কাম-রাঁধুনি-কাম-বেডকমপ্যানিয়ন পাচ্ছে। তার পরেও আবার দুষ্টুমি। আমাকে তো অফিসে জ্বালিয়ে খেলো—সব সময় কেউ না কেউ ছুঁকছুঁক করছে। একলা একটু বেরবো তারও উপায় নেই। হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে পার্ক স্ট্রীটে একটা রেস্তোরাঁয় বসতে গেলাম, অমনি এক মাড়োয়ারি ছোকরা পাশের

টেবিলে বসে উসখুস করতে লাগলো। ফ্রায়েড রাইস এবং চাউমিনের মতো মেয়েদেরও এরা খাবার জিনিস মনে করে—অপরিচিত মেয়ে দেখলেই নোলা লকলক করে ওঠে।"

"তোর মাথায় একটা গাঁট্টা বসাবো," পারমিতা এবার মাধবীকে বললো। "লেখাপড়া শিখেছিস, চাকরি করিস, হ্যান্ড ব্যাগে ছুরি আছে—তবু নিজেকে ছেলেদের সমান মনে করতে পারলি না? এখনও সেই গেঁয়ো মেয়ের মতো ভীতু রয়ে গেলি। সব সময় কমপ্লেক্সে ভুগছিস।"

মাথা চুলকালো মাধবী। "বেশ বাবা, কোনোরকম কমপ্লেক্সে ভুগবো না। কিন্তু রেস্তোরাঁয় আজ রাতে শেষ পর্যন্ত কী হলো শোনো: সুদর্শন খান্না—যে ছোকরার সঙ্গে আমার আজ বেরোবার কথা ছিল, এবং যে স্লিপ পাঠালো আসতে পারবে না—দেখি সেই ছোঁড়াই অন্য একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকছে। ধরা পড়ে গিয়ে, ছোঁড়া আবার মিথ্যে কথা বললো। বললো, সঙ্গের ছুঁড়িটা নাকি তার কাজিন। রাতের বেলায় কাজিন সিস্টারকে একলা নিয়ে কেউ রেস্তোরাঁয় আসে! আমি এমনই বোকা! কোনো ব্যাটাছেলে ছাড়া এমন কাঁচা মিথ্যে আর কেউ বলতে পারে?"

"যা এখন শুয়ে পড়গে যা," অণিমাদি এবার মাধবীকে অনুরোধ করলেন। মাধবী চলে যাবার পরে পারমিতা বললো, "কেন যে মেয়েটা যার তার সঙ্গে যখন তখন ঘুরে বেড়ায়। মাথায় একটু ছিটও আছে বোধহয়?"

অণিমাদি বললেন, "আজকের পার্টিতে হঠাৎ অপর্ণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। অপর্ণাকে মনে আছে তোমার? তোমাদের সঙ্গে পড়তো। তোমাদের থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের একজন।"

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলতে পারমিতা, অপর্ণা এবং সুভদ্রা। এরা তিনজনে হৈ-চৈ হট্টগোল করে কলেজটাকে মাতিয়ে রাখতো। অণিমাদির মনে পড়লো, এদের মধ্যে পারমিতাই বরং প্রথম দিকে একটু ভীরু ছিল।

সেই যে শেষ পর্যন্ত এমন হবে—মফস্বল শহর থেকে সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে এই কলকাতার মার্চেন্ট আপিসের জাঁদরেল অফিসার হবে কে জানতো?

"অপর্ণার সঙ্গে দেখা হলো তোমার? এই কলকাতা শহরে অপর্ণা? কী করছে সে?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি এখানে আছো শুনে খুশী হলো। একদিন ফোন করবে তোমাকে। আপিসের নম্বর নিয়েছে।"

অফিসে ঢুকবার সময় দারোয়ান এবং ঝাড়ুদারের বউ লছমী দুজনে সেলাম করলো পারমিতাকে। মেয়েরা যে অফিসার হতে পারে—তারা যে শুধু অফিসারের বউ নয় এই ব্যাপারটা এতো দিনে হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার নিচের তলার কর্মচারীদের সড়গড় হয়েছে।

চেয়ারম্যানের বেয়ারা মুকুন্দ এসে গিয়েছে। মুকুন্দর সকাল-ডিউটির ব্যবস্থা পারমিতাই করেছে—কারণ মিস্টার চৌধুরী প্রায়ই অফিস টাইমের অনেক আগে হাজির হন। একদিন হঠাৎ এসে পড়ে পারমিতা দেখে মিস্টার চৌধুরী নিজেই টেবিল চেয়ার মুছছেন। পারমিতা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সুদর্শন বললেন, "ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও টেবিল মুছবার জন্যে বেয়ারা থাকে না। বিলেত, আমেরিকা, জাপানের পলিসি হলো—নিজের টেবিল নিজে মোছো, সে তুমি যেই হও।"

পারমিতার কাছে ব্যাপারটা সিমবলিক মনে হয়েছিল। ঝাড়ন হাতে এই হ্যারিংটন ইন্ডিয়াকে ক্লেদমুক্ত করবার জন্যেই যেন সুদর্শন চৌধুরী এখানে এসেছেন।

সুদর্শন চৌধুরী বলেছিলেন, "শিল্পবিপ্লব আমাদের দেশে এসেও

আসতে পারছে না কেন জানো? আমাদের এই কলোনিয়াল মনোবৃত্তির জন্যে। বাইরে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর রং বদলাচ্ছে—এয়ার কন্ডিশনার বসছে, মডার্ন স্টীল ফার্নিচার আসছে, নানা রকমের হিসেবের যন্ত্রপাতি আমদানি হচ্ছে, ইউনিট রেকর্ডার এবং আই-বি-এম কমপিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করছি আমরা—কিন্তু আমাদের মন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। এই অফিসেই দেখবে সিনিয়র অফিসারদের দারোয়ান কীভাবে ছাতা হাতে করে গাড়ি থেকে বার করে আনে--মনে হবে যেন বর আসছেন বিয়ে করতে।" চুরুটে টান দিয়ে চৌধুরী বলেছিলেন, "নতুন যখন চাকরিতে ঢুকেছিলাম, তখন এই অফিস কালচারে অনেক বিসদৃশ ব্যাপার আমার নজরে পড়তো। নামাবলী গায়ে দিলেই যেমন পুরুত হওয়া যায় না—তেমনি বাইরে ছিমছাম হলেই মডার্ন হওয়া যায় না।"

পারমিতা পুরোপুরি একমত হয়েছিল মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি আরও বলেছিলেন, "তোমাদের ফ্রেশ মাইন্ড—নতুন ভাবনা-চিন্তা নিয়ে এসেছো এই বি-বি-ডি-বাগ কালচারে। চোখ খুলে রাখলে অনেক কিছু দেখতে পাবে।"

চোখ না খুলেই পারমিতা এই অফিসে কত কি দেখতে পায়। কোনো লোক ভারি জিনিস নিজে হাতে তুলবে না। একটা প্যাকেটের ওজন দেড় কিলো হলেই, হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে কখন বেয়ারা আসবে। এই সব ব্রাউন সায়েবরাই বিদেশে গিয়ে বিনা প্রতিবাদে নিজের লগেজ নিজেই সর্বত্র বয়ে বেড়াবেন। এখানে অফিসের ওয়াটার-কুলার থেকে কেউ নিজের জল বয়ে আনবেন না। কেউ সাহস করে নিজের জল নিয়ে এলে অফিসে হৈ চৈ পড়ে যাবে। একটা অলিখিত জাতিভেদ-প্রথা এবং অস্পৃশ্যতাবোধ যেন সকলের জ্ঞাতসারেই হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার প্রতি স্কোয়ার ফুটে বিরাজ করছে। কে অফিসার, কে কেরানি, কে বেয়ারা তাই নিয়ে সর্বদা সীমানা নির্ধারণ কমিশন গোপনে কাজ করছে। পদমর্যাদা অনুযায়ী সব কিছু আলাদা হওয়া চাই—আলাদা বসবার জায়গা,

আলাদা টয়লেট, আলাদা খাবার ঘর।

অফিসার কেরানি এবং সাব অর্ডিনেট কর্মীর মধ্যেও আবার কতরকমের ভাগ—গ্রেড ওয়ান, গ্রেড টু, গ্রেড থ্রি টু গ্রেড ইনফিনিটাম। সত্যি অন্তহীন শ্রেণীভেদ। যতই দিন যাচ্ছে ততই এই সব ভাগাভাগি আরও বাড়ছে। বিশেষ কোনো একটা শ্রেণীকে এর জন্যে দায়ী করা যাবে না। বড় সাহেব থেকে আরম্ভ করে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই জ্ঞানত বা অজ্ঞানত এই জাতিভেদ প্রথাকে আরও মদত দিয়ে যাচ্ছেন।

সুদর্শন চৌধুরীর নির্দেশ মতো পারমিতা একবার এ-বিষয়ে একটা গোপন নোট তৈরি করেছিল। তাতে পারমিতা লিখেছিল—এই অফিসে নতুন লোকজন নেবার আর্থিক সঙ্গতি নেই, অথচ কারখানার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে বেশ লোকাভাব। আমরা যদি অফিসে যে যার টেবিল-চেয়ার মুছে নিই, যদি আমরা সবাই নিজেদের গেলাসে জল ভরি, নিজেদের চায়ের কাপ নিজেরা পরিষ্কার করি, শুধু সায়েবদের সেলাম জানানোর জন্যে এবং দরজা ঠেলে খুলে দেবার জন্যে বাইরে পাগড়ি-পরা লোক দাঁড় করিয়ে না রাখি, পাঁচ ছ'শ্রেণীর টয়লেট এবং চার রকমের ক্যানটিন ঘর না রেখে একটা করি—তা হলে কী হয়? বাইরের সম্মানিত কোনো অতিথি এলে সায়েবের সেক্রেটারি নিজে কফি বা চা তৈরি করে দেবেন। ফাইফরমাস খাটবার কোনো লোক অফিসে থাকবে না, কোনো টেবিলে বা কোনো ঘরে কলিং বেল বা ঘন্টি বাজবে না। তা হলে কেমন হয়? তাতে কাজের পরিবেশটা সত্যিই কাজের হয়ে উঠবে। কারুর তাতে চাকরি যাচ্ছে না—বাড়তি লোকদের উৎপাদনের কাজে লাগানো যাবে।"

নোটটা পড়ে সুদর্শন চৌধুরী খুব খুশী হয়েছিলেন, "ঘরকন্নার মতো অফিসকন্নার কাজটা মেয়েদের হাতে পড়লে এদেশের দ্রুত উন্নতি হবে। আমাদের মেয়েদের সব আছে।"

"একটু আত্মবিশ্বাসের অভাব ছাড়া," পারমিতা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল।

সুদর্শন চৌধুরী হেসে বলেছিলেন, "আত্মবিশ্বাস কি রাতারাতি হয়?

কত যুগ-যুগান্তর ধরে আমাদের মেয়েরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়নি। তাদের কিছুই করতে দেওয়া হয়নি। মেয়েরা যেদিন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে, সেদিন ভারতবর্ষের চেহারাই পাল্টে যাবে।"

সুদর্শন চৌধুরী যা বলছেন তা শুনতে খুব ভাল লাগে পারমিতার। সত্যি, মেয়েরা তো এই অভাগা দেশের জন্যে কিছু করবার সুযোগ পায় নি। সুযোগ সুবিধে পেলে তারাও বা কেন পুরুষের সমান হতে পারবে না? কিন্তু আত্মবিশ্বাস! ওইটে মস্ত এক কথা বললেন মিস্টার চৌধুরী। লেডিজ হোস্টেলের মাধবী, অণিমাদি, অমৃতা প্রীতম, প্রতিভা কাপুর, এদের কোনোদিন কি আত্মবিশ্বাস আসবে? এরা প্রত্যেকেই তো নার্ভের এক একটা বাণ্ডিল।

এই ভোরবেলায় অফিসে বসে এসব কথা ভেবে লাভ নেই। টেবিলে অজস্র চিঠি পড়ে রয়েছে। সেগুলো খুলতে খুলতেই সুদর্শন চৌধুরী এসে পড়বেন। তারপর কত রকমের কাজ শুরু হবে।

মুকুন্দ ইতিমধ্যেই টেবিল মুছে রেখেছে। আরও এক বস্তা চিঠি এনে সে মেমসায়েবের টেবিলে রেখে গেলো। আগে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করতো, সেখানে বেয়ারা পারমিতাকে দিদিমণি বলতো। এখানে দিদিমণির ব্যাপার নেই—একেবারে মেমসায়েব। খোদ বড়সায়েবের স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট—তিনি যদি মেমসায়েব না হন, তা হলে কে হবেন?

চিঠির প্যাকেটগুলো পারমিতা খুলতে আরম্ভ করলো। ব্যবসায়ী অফিসে চিঠির জঙ্গল। কিছুদিন ঘাঁটলে চিঠি শব্দটা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ধরে যায়। ইস্কুলে-কলেজে পড়বার সময় চিঠি শব্দটায় কেমন একটা মাদকতা অনুভব করতো, পারমিতার মনে পড়ে গেলো। কিন্তু মার্চেন্ট অফিসের চিঠির জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে বাঘ বেরিয়ে পড়ে। একখানা চিঠি খুললো পারমিতা—সই ছাড়া টাইপ করা চিঠি। তাতে ভেঙ্কটরমণ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানির ভিতরের খবরাখবর তিনি নাকি এখন মিস্টার ভোগীলাল পোদ্দারের কাছে পাচার করছেন। চিঠিটা একটা আলাদা হলদে ফোল্ডারের মধ্যে পুরে রেখে দিল পারমিতা। সই না-

থাকলেও চিঠিটা মিস্টার চৌধুরীকে দেখাতে হবে।

মিস্টার চৌধুরী বলবেন, "এই উড়ো চিঠি হলো মার্চেন্ট অফিস কালচারের অঙ্গ। যতই অপছন্দ করো এ ধরনের চিঠি আসবেই।"

এর পরে নিজের নামে একটা খাম পেয়ে বেশ খুশী হলো পারমিতা। কিন্তু খামটা খুলে ভোরবেলার মেজাজটা নষ্ট হয়ে গেলো। অশ্লীল ভাষায় উড়ো চিঠি লিখেছে কেউ। পারমিতা সম্বন্ধে নানা কুৎসিত ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই সঙ্গে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, "চেয়ারম্যানের শয্যাসহকারিণী না-হয়ে মায়ের কাছে ফিরে যাও, তার জন্যে অপেক্ষা করো যাকে যথাসর্বস্ব বিনামূল্যে দেওয়া যায়।" শরীরটা রি-রি করে উঠল পারমিতার--ভোরবেলায় স্নানের পর গায়ের ওপর একরাশ জঞ্জাল পড়লো। কিন্তু কিছু করবার নেই। মাধবীর কাছে শুনেছে পারমিতা, এক-আধটা নোংরা চিঠি মেয়েদের হাতে আসবেই—অফিসে যেমন অজস্র ভাল লোক আছেন, তেমনি মানসিক অসুস্থ লোকের অভাব নেই।

চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললো পারমিতা। এইসব সামান্য ব্যাপারে মিস্টার চৌধুরীকে ব্যস্ত করে লাভ নেই।

সুদর্শন চৌধুরী এসেই গত রাত্রে লেখা পারমিতার নোট পড়লেন। সরকারী হাতে পড়বার পর থেকে হ্যারিংটন ইন্ডিয়া কীভাবে অর্থনৈতিক বিপদ কাটিয়ে উঠছে পারমিতা তা সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। কারখানার প্রোডাকশনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ন্যায্য দাম পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা পারমিতা গ্রাফের সাহায্যে দেখিয়েছে। হ্যারিংটন্ ইন্ডিয়া এখন চায় কিছু কনজিউমার আইটেম তৈরী করতে--যেসব জিনিস সাধারণ মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে লাগে, সেসব জিনিসের বিক্রি বাড়ানো সহজ। এতোদিন শুধু অন্য কারখানায় যা প্রয়োজন হয় এমন জিনিস তৈরী করে কোম্পানি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কী কী জিনিস উৎপাদন করলে কারখানার ক্ষতির ভাগ কমবে, তার একটা তালিকা সুদর্শন চৌধুরী তৈরী করিয়েছেন। এবং সামান্য কিছু অর্থ বিনিয়োগ করে কেমন নতুনভাবে জিনিস তৈরী করা যাবে সে-সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই অনেক বিস্তারিত

নোট তৈরী হয়েছে। পারমিতা নিজের নোটে সেইসব খবর বেশ সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছে।

পারমিতাকে ডেকে সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস! চমৎকার নোট হয়েছে। আমরা কোথায় ছিলাম, ঘটনাচক্রে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি এবং কোথায় যেতে চাই তা এই নোট থেকে ব্যাংকের কর্তারা বুঝতে পারবেন। আমার কী মনে হয় জানো, এই কোম্পানির রুগ্ন হবার কোনো কারণ ছিল না। এই কোম্পানির কারখানায় ভাল ভাল যন্ত্রপাতি আছে। বহু কাজের লোক আছে ফ্যাকটরি এবং অফিসে, কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে কোম্পানিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তা তাঁরা জানেন কিন্তু কয়েকটা লোকের আকাশছোঁয়া লোভ কোম্পানিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।"

"দু-চারজন লোকের লোভের জন্যেই তো সমস্ত দেশের সর্বনাশ হয়ে যায়," পারমিতা বললো।

সুদর্শন পেন্সিল হাতে পারমিতার তৈরী খসড়া নোটের ওপর আর-একবার চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন, "আমাদের বিদেশে মাল পাঠাবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলবে না?"

পারমিতা লজ্জা পেয়ে গেলো। রপ্তানির ব্যাপারটা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এক্সপোর্ট-সংক্রান্ত ফাইলটা হোস্টেলে নিয়ে যাবার কথাও মনে ছিল না। সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "লজ্জা পাবার কিছু নেই। মেয়েরা যে এমন নোট তৈরি করতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না।"

"এক্সপোর্ট ফাইলটা দেবো আপনাকে?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

সুদর্শন বললেন, "গতকাল বিলেত থেকে রাত্রিবেলায় ট্রাংক-টেলিফোন পেয়েছি। অনেক চাঞ্চল্যকর সম্ভাবনা রয়েছে। আমি দু-একদিনের মধ্যে বিলেত থেকে চিঠি পাবো আশা করছি। তখন ওই বিষয়ে লিখবো। বাকি নোটটা আজই ব্যাংকে চলে যাক।"

ফাইলটা পারমিতার হাতে দিয়ে সুদর্শন বললেন, "শুধু ব্যবসা বাড়ালেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। মিস্টার পোদ্দারের

চেলাচামুণ্ডারা এখনও ভিতরে রয়ে গিয়েছেন। তাঁদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতেই হবে।"

নিজের ঘরে ফিরতেই পারমিতার টেলিফোন বেজে উঠল। "হ্যালো, মিতা! আমি অপু বলছি। কোথায় ছিলি সকাল থেকে? এই নিয়ে তিনবার রিং করলাম।"

অপু মানে অপর্ণা। ওর গলা শুনে বেশ খুশী হলো পারমিতা। অপু বললো, "আগামী রবিবার নিশ্চয় অফিস করছিস না—তোকে ভোরবেলায় নিয়ে আসবো, তারপর সারাদিন আমাদের সঙ্গে থাকবি। বুঝলি?"

পারমিতা না বলতে পারলো না। একদিকে ভালই হলো। ছুটির দিনগুলো অনেক সময় দুঃসহ হয়ে ওঠে। অণিমাদি আবার এই সপ্তাহে মায়ের কাছে যাচ্ছেন। হোস্টেলের বাকি মেয়েগুলোর সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলা দায়—যে প্রসঙ্গই উঠুক, ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত পুরুষমানুষের সাবজেক্টে ফিরে আসবে।

অফিস থেকে বেরুবার আগে আর একটা কার্ড পাওয়া গেলো। ককটেল নিমন্ত্রণ জানিয়েছে মিস্টার ভেঙ্কটরমণ। স্থান সুতানুটি ক্লাব, সময় রবিবার সন্ধ্যা। কার্ডটা হাতব্যাগে পুরে, ইন্টারন্যাল টেলিফোনে ভেঙ্কটরমণের পি.এ-কে পারমিতা জানিয়ে দিলো যে সে পার্টিতে আসবে।

পারমিতাকে দেখেই অপর্ণা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ওর হাতদুটো ধরে বুকের কাছে এনে অপর্ণা বললো, "উঃ, তোর সঙ্গে যে এইভাবে দেখা হবে স্বপ্নে ভাবিনি।"

পারমিতাও পুরানো বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরলো। তারপর অনেকক্ষণ

ধরে সে অপুকে দেখলো। পারমিতা বললো, "তোকে দেখছি—কতখানি বদলিয়েছিস মেপে নিচ্ছি।"

"ও! একটু ওজন ভারি হয়েছি বলে, টিটকিরি দিচ্ছিস।"

অপর্ণা ভুল বুঝলো, মোটেই তা নয়। সে এমন কিছু মোটা হয়নি। তবু অপর্ণা বললো, "তাও ভাগ্যিস এখন দেখলি, সাত সপ্তাহ আগে দেখলে তুই মাথায় হাত দিয়ে বসতিস।"

"এই সাত সপ্তাহে কী এমন কাজকর্ম করলি?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"মোটা হয়ে যাচ্ছিলাম বলে, মিসেস চাড্ডার ক্লিনিকে বিউটি ট্রিটমেন্ট নিলাম। সাত শ টাকায় সাত শ গ্রাম ওজন কমিয়ে দিয়েছে।—স্রেফ বিউটি ক্লিনিকে গেলেই হলো। কোনোরকম পরিশ্রম করতে হয় না, খাওয়া-দাওয়ার কোনো বিধিনিষেধ নেই," অপর্ণা জানালো।

"প্রচুর পয়সা বুঝি তোর বরের?" হেসে জিজ্ঞেস করলো পারমিতা।

"মোটেই নয়! সংসার খরচ থেকে লুকিয়ে টাকা বাঁচিয়ে আমাকে বিউটি ক্লিনিকে যেতে হলো। কলকাতার হাই সোসাইটিতে যা হালচাল—বউ একটু মোটা হলে বর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার চান্স আজকাল খুব বেশি। তেমন বুঝলে আমি গয়না বেচে স্লিমিং কোর্সে জয়েন করতাম।"

এই সব কথা কার মুখে শুনছে পারমিতা? তাদের ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবিনী ছাত্রীর মুখে? যে-মেয়ে বিরাট বিরাট ইংরিজি উপন্যাস পড়তো। বার্নার্ড শ'র সমাজ চেতনার ওপর প্রবন্ধ লিখে যে প্রাইজ পেয়েছিল। মেয়েরা এদেশে পুরুষমানুষের ওপর বড় বেশি নির্ভরশীলা বলে যে সমালোচনা করতো। যে-মেয়ে একবার রাস্তায় শ্রীবাস্তব বলে এক ছোকরাকে এক থাপ্পড় লাগিয়েছিল।

শ্রীবাস্তবের দোষ সে পারমিতার নামে উড়ো চিঠি পাঠিয়েছিল। প্রেমপত্র—অথচ তলায় সই নেই। চিঠিটা থ্রি মাস্কেটিয়ার্সরা দেখেছিল। অপু বলেছিল, "হাতের লেখাটা যেন শ্রীবাস্তবের মনে হচ্ছে।" ছুতো

করে সে শ্রীবাস্তবের ক্লাসের খাতাখানা একবার চেয়ে নিয়েছিল। তারপর হাতের লেখা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে পারমিতাকে বলেছিল, "তুই ক্লাসের মধ্যে ওর গালে চড় লাগা। আমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকছি।" পারমিতার সাহস হয়নি। ইতিমধ্যে আবার শ্রীবাস্তবের কাছ থেকে উড়ো চিঠি এসেছিল। তখন অপর্ণা বলেছিল, "মেয়েদের ওরা নরম ভেবে নিয়েছে বলেই যত গোলমাল।"

তারপর একদিন রাস্তার ওপর পারমিতা ও সুভদ্রা ঘিরে ধরেছিল শ্রীবাস্তবকে এবং তার গালে অপু এক থাপ্পড় লাগিয়েছিল। "চিঠি লিখতে হলে—নাম ঠিকানা দিতে হয়, এটুকুও জানো না ইডিয়ট। এবার বাঁদরামো করলে ক্লাসের মধ্যে চড় খাবে," এই ভয় দেখিয়েছিল অপর্ণা।

বেশ ভয় পেয়েছিল পারমিতা ও সুভদ্রা। ভেবেছিল, শ্রীবাস্তব ছোকরা অপমানিত হয়ে আবার কোনো গোলমাল বাধাবে। কিন্তু কিছুই হয়নি, বরং লজ্জায় ছোঁড়াটা কলেজ থেকে পালালো।

পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "তোর বর কোথায়? কবে বিয়ে করলি কিছুই বলছিস না।"

অপু হেসে উত্তর দিলো, "তাও ভাল। কেন বিয়ে করলাম জিজ্ঞেস করছিস না। বাড়িতে চল সব বলবো।"

বাড়ি পৌঁছে বরকে দেখাতে পারলো না অপর্ণা। অফিস থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে স্বামী বেরিয়ে গিয়েছেন। "এই হয়েছে মুশকিল—কাজ আর কাজ ছাড়া অফিসের কর্তারা কিছুই বোঝে না। আর বিয়ে করার পর বরগুলোও বেপরোয়া হয়ে যায়—ভাবে বউ তো হাতের পাঁচ রইলো। হতো যদি বিলেত আমেরিকা, তা হলে মজা বুঝতো।"

"কী মজা বুঝতো?" হেসে প্রশ্ন করলো পারমিতা।

"বউকে রেগুলার সান্নিধ্য না দিলে বউ হাতছাড়া হয়ে যেতো! তুই তো সায়েবী আপিসে চাকরি করিস, তোর অন্তত জানা উচিত—সেক্স বা ভাত-কাপড়ের জন্যে মেয়েরা ওদেশে বিয়ে করে না, ওসব বিয়ে ছাড়াই যথেষ্ট পাওয়া যায়। ওখানে মেয়েরা বিয়ে করে সান্নিধ্যের জন্যে।"

বরের ছবি দেখালো অপু। "ইনিই হচ্ছেন, আমার ভাগ্যবিধাতা শ্রীরমেন বাসু। আর ওই যে ছবি দেখছো—আমার কন্যা মধুমিতা, তিন বছর বয়েস। গতকাল বাবা-মা এসেছিলেন। নাতনীকে জোর করে নিয়ে গেছেন, কাল সকালে ফেরত দিয়ে যাবেন। বাবা-মা তো লেক-টাউনে বাড়ি করেছেন।"

পারমিতা বললো, "অপু, তুই তাহলে পুরোপুরি কলকাত্তাওয়ালী হয়ে গেলি। তোর মনে পড়ে, শীতলপুর কলেজে পড়বার সময় আমরা কলকাতায় আসবার জন্যে কী রকম ছটফট করতাম। কলকাতা বললেই বুকের ভেতরটা কী রকম করে উঠতো।"

"সেসব ভাবলে এখন হাসি লাগে, মিতা। ক্যালকাটা এমন কিছু একটা জায়গা নয়—আসলে আমাদের পুরনো শীতলপুরের মতোই আর একখানা গাঁ, সাইজে একটু বড়ো, এই যা।"

পারমিতা বললো, "আমারও কলকাতায় আসবার স্বপ্ন ছিল; আমারও ভয় ছিল মফস্বলের মেয়ে আমি কলকাতায় একেবারে হেরে যাবো, একেবারে হারিয়ে যাবো।"

"হেরে তুই তো মোটেই যাসনি," অপু বললো। "আমি শুনেছি অফিসে তোর বেজায় নাম। কয়েক ডজন পুরুষমানুষকে তুই নাকি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিস।"

"ওমা! এসব কথা কে বললো তোকে?" পারমিতা জিজ্ঞসা করে।

"খবর রাখতে হয়। আমার দূর-সম্পর্কের ননদের স্বামী যে তোদের অফিসে কাজ করে। ননদায়ের নামটা আমার আবার মনে থাকে না। ননদের নাম বৃন্দা।"

"বৃন্দা দাশগুপ্তা?" পারমিতা জিজ্ঞেস করে।

"চিনিস?"

"মিস্টার সুজন দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। স্ত্রীকেও দেখেছি মাঝে মাঝে স্বামীকে পিক্-আপ করতে অফিসে আসেন।"

"আজকাল ওইটাই ফ্যাশন হয়েছে, তাই না? মাঝে মাঝে স্বামীকে

বিকেল-বেলায় অফিস থেকে নিয়ে আসা। আমার কর্তার তো ইন্ডিয়ান কোম্পানি—ওদের ওসব স্টাইলের বালাই নেই।"

অপু যে প্রেম করে বিয়ে করেছে এমন একটা গুজব অনেকদিন আগে পারমিতার কানে এসেছিল। বিহার থেকে অপু চলে গিয়েছিল দিল্লীতে। সেখানেই সমাজতত্ত্বে এম.এ. পাস করেছে অপু। "দিল্লীতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও করেছিলাম, জানিস মিতা। রমেন আমাদের সঙ্গেই পড়তো। পুরো তিন বছর লেগেছিল সব কিছু সামলাতে।"

"কেন ?" মিতা জিজ্ঞেস করলো।

"ওর বাবা মায়ের ইচ্ছে ছিল না জাতের বাইরে বিয়ে হোক। আমার বাবা-মাও খুব একটা উৎসাহ দেখাননি।"

"তারপর ?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"তুই তো জানিস, আমার গোঁ কী রকম। যখন বলেছি, ওই আমটি খাবো পেড়ে, তখন খাবোই।"

"তুই রমেনবাবুর জন্যে খুব হ্যাংলামো করেছিলি ?" জিজ্ঞেস করে পারমিতা।

"মোটেই না। ঠিক তার উল্টো। দেখা হলেই দুজনে ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা করতাম। সমাজতত্ত্ব বাদ দিয়ে তো কিছু হয় না আজকাল।"

হঠাৎ হাসতে লাগলো অপু। "হাসছিস কেন ?" জিজ্ঞেস করলো পারমিতা।

"তখন আমাদের দুজনের ইনটেলেকচুয়াল আলোচনা এবং তর্ক যারা শুনতো তারা অবাক হয়ে যেতো। অনেকে বলতো, এরা আদর্শ ইনটেলেকচুয়াল দম্পতি হবে। আমিও ভাবতাম দুজনে মিলে অনেক কিছু কাজ একসঙ্গে করা যাবে।"

"সেসব করিস না ?" জিজ্ঞেস করে পারমিতা।

"দূর !" ঠোঁট বেঁকালো অপু ! "বিয়ের পর দু-তিনটে মাস ব্রাউনিং দম্পতির মতো হবার ইচ্ছে ছিল। তারপর সেসব কোথায় ভেসে গেলো। থীসিস ইনকমপ্লিট রেখে ও দিশী কোম্পানিতে চাকরিতে ঢুকলো। আর

আমি দেখলাম, হাজার হাজার মেয়েদের থেকে আলাদা হবার চেষ্টা করার মানে হয় না, মেয়েদের পক্ষে সনাতন ঘর সংসারই ভাল।"

"তোরা এখন ঘর সংসারের বাইরে কোনো জিনিস নিয়ে আলোচনা করিস না?"

"মোটেই না। মেয়েটার যে একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। তা ছাড়া ওকে অফিসের কাজে লোককে এনটারটেন করতে হয়, বাড়িতে বিজনেসের অতিথি লেগেই আছে। আর তুই তো জানিস, বিজনেসের লোকরা ড্রিংকস খাবার সময় গভরমেন্টকে গালাগালি এবং শ্রমিকদের আদ্যশ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই পারে না।"

"ওদের বউরা?" পারমিতা জিজ্ঞেস করে।

"তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। নিজেদের চাকরবাকর সম্বন্ধে শুধু আলোচনা করে। আজকালের চাকররা নাকি বেজায় কুঁড়ে, মাইনে চায়, বাজারের টাকা চুরি করে, লুকিয়ে দুধ খেয়ে নেয়, দেশে গেলে আর ফিরতে চায় না। তুই বিশ্বাস করবি না, আমারও আজকাল ওই সব সাবজেক্ট বেশ ভাল লাগে। ইন্ডিয়ান অফিসের কর্তাব্যক্তির বউরা এর পরে সময় পেলে গয়নাগাটির আলোচনা করে।"

"কার কত ভরি সোনার গয়না হলো, এই তো?" পারমিতা হেসে জিজ্ঞেস করে।

"সোনার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে, মিতা। হাই সোসাইটিতে এখন শুধু দামী দামী পাথরের আলোচনা হয়। কার স্বামী ঠাকোরলাল হীরালাল থেকে হীরের দুল এনে দিয়েছেন, কার স্বামী সীতারামদাস থেকে অনেক কষ্টে একটা দুষ্প্রাপ্য নাকছাবি সংগ্রহ করেছেন, কার স্বামী বোম্বাইয়ের জাভেরী ব্রাদার্স ছাড়া জুয়েল কেনেন না—এই সব গল্প।"

অপু এবার জিজ্ঞেস করলো, "তুই কলকাতায় ছুটির দিনে কী করিস?"

"কলকাতায় কত কি করবার আছে তুই তো জানিস। আমি নতুন এসেছি—তাই ইতিহাসের সেইসব বিখ্যাত জায়গা দেখতে যাই।

রবীন্দ্রনাথের বাড়িটায় সেদিন সমস্ত সকাল কাটিয়ে এলাম। নেতাজী ভবনটাও দেখেছি। বিবেকানন্দের বাড়িটাও আমার দেখবার খুব ইচ্ছে—কিন্তু খুঁজে পেলাম না। তুই জানিস নাকি কোথায়?"

বেশ অবাক হয়ে গেলো অপু। "কোন গলিঘুঁজিতে কে কবে জন্মেছিল তা দেখে কী লাভ হবে আমার?"

"ওসব জায়গায় গেলে মনটা কীরকম হয়ে যায় অপু। ছোটবেলা থেকে এঁদের নাম শুনছি—জায়গাগুলো নিজের চোখে দেখলে শরীরে কী রকম একটা শিহরণ হয়।"

অপু মোটেই ভিজলো না। বললো, "বলিহারি রবিঠাকুরকে—জন্মাবার আর জায়গা পেলেন না, জন্মালেন কিনা ওই চিৎপুরের জঙ্গলে। ওখানে গাড়ি নিয়ে কে ঢুকবে বাবা?"

পারমিতা বললো, "একলা সব ঘুরে দেখা মুশকিল। তুই এবার থেকে প্রোগ্রাম কর, দুজনে সব ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে—কোথায় উইলিয়ম থ্যাকারে জন্মেছিলেন, কোন বাড়িতে শরৎচন্দ্র পথের দাবী লিখেছেন, রামকৃষ্ণদেব কোথায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এসব দেখবার সুযোগ কলকাতায় না-এলে পাওয়া যেতো না।"

"তুই এখনও মানুষ হলি না", মন্তব্য করলো অপু। "এতো ভাল থিয়েটার হচ্ছে কলকাতায়, তাই দেখি না আমি হল্‌গুলো নন্‌-এয়ারকণ্ডিশন্‌ড বলে।"

অথচ এই অপুই একদিন শীতলপুরে রবীন্দ্রনাথ যে-বাড়িতে রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং চার লাইনের এক কবিতা লিখেছিলেন তা দেখবার জন্যে পনেরো মিনিট বৃষ্টিতে ভিজেছিল। কিন্তু কলকাতার সে কিছুই দেখেনি—তার যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে এয়ারকণ্ডিশন সিনেমা, রেস্তোরাঁ এবং ক্লাবের মধ্যে সীমায়িত হয়ে পড়েছে।

না, আরও কিছু চেনে অপু। কোথায় জাগ্রত দেবদেবী আছেন এবং নামকরা হস্তরেখাবিদরা কোথায় থাকেন তাও মোটামুটি মুখস্থ হয়ে গিয়েছে অপর্ণার। অপু সোফায় বসে কফি তৈরি করতে করতে

পারমিতাকে বললো, "কম বয়সে যে সব হৈ-চৈ হট্টগোল করেছিলাম, ওসব নিতান্তই ছেলেমানুষী। মেয়েদের নিজস্ব কোনো অস্তিত্বই নেই, এই সার সত্যটুকু এতোদিনে বুঝেছি। মনের মতো স্বামী পেয়েছি, মেয়েটাও ফুটফুটে, অভাব নেই। এখন আমার আর একটা ইচ্ছে আছে। সেই ইচ্ছে পূরণের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি।"

"এবার কি ভাবছিস, অন্য মানুষদের কীভাবে মঙ্গল হয় তার চেষ্টা করবি? তুই যে বলতিস, মেয়েরা নিজেরা দলবদ্ধভাবে না চেষ্টা করলে এদেশে মেয়েদের কোনো উন্নতি হবে না।" পারমিতা অবাক হয়ে অপুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

অপু মুখ বেঁকালো। "তুই কি ভেবেছিস, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবো? যে-মেয়ের কপালে যা আছে তাই হবে। আমি কি করবো? আমার এখন একটা প্রার্থনা, ঈশ্বর আমাকে একটা ছেলে দাও! ওকে একটা বংশধর দিতে পারলেই আমি ধন্য হয়ে যাই।"

এই অপুই একদিন বলেছিস, "মায়েরা ছেলে ছেলে করে পাগল হয় কেন বল তো? মেয়েরা বুঝি বংশধর নয়? মেয়েদের বুঝি কোনো দাম নেই?"

পারমিতা বলেছিল, "মেয়েরাই তো এদেশে মেয়েদের দাম কমিয়ে দিলো। মেয়েদের যত অপমান চলছে, তার প্রায় সবটাই তো মেয়েরাই বাঁচিয়ে রেখেছে। পণপ্রথার সবচেয়ে বড়ো সাপোর্টার পাত্রের মা ; মেয়েকে শিকল পরিয়ে কারুর বংশরক্ষার মেশিন হিসেবে তৈরি করেন মেয়ের মা। মেয়ে যদি কোনোরকমে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালো, তখন মেয়ের রোজগার খেতে বাবা-মায়ের আত্মসম্মানে লাগে। অণিমাদিকে দেখছি তো।"

"তুই আর আমায় জ্বালাস না, মিতা। মেয়েদের স্বাধীন হয়ে কিছুই লাভ নেই—কথাটা বুঝতে পারবি বিয়ের পরে। সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে জাগ্রত একমা আছেন—ছেলের কামনায় ওঁর কাছে শনিবারে যাই আমি। তুইও চল, মনের মতো বর চা, পেয়ে যাবি।" অপু এবার পারমিতার মুখের

দিকে তাকিয়ে রইলো।

"কী দেখছিস?" পারমিতা অস্বস্তি বোধ করলো।

"বেশ তো খুকী খুকী চেহারাটা রেখেছিস। অফিসে পছন্দসই ছেলেছোকরা কেউ নেই?" অপু জিজ্ঞেস করলো।

"অফিসটা কাজের জায়গা অপু, ছেলেখেলার জায়গা নয়," পারমিতা বললো।

"ওমা! বিয়েটা কি ছেলেখেলা? মেয়েদের পক্ষে মস্ত বড় একটা কাজ।"

"তুই একেবারে গোল্লায় গিয়েছিস, অপু," বকুনি লাগালো পারমিতা।

"খোঁজখবর রাখছি আমি, মিতা। ননদের থ্রু দিয়ে এবং আরও বিভিন্ন সোর্সে খবর পেয়েছি, এক আধজন এলিজিবল ব্যাচিলার তোমার জন্যে ছটফট করছে।"

"আমার জন্যে? কে শুনি?" পারমিতা এবার শাড়ির আঁচলটা কাঁধের ওপর তুলে জিজ্ঞেস করলো।

"ওইভাবে আঁচল গোটাচ্ছিস কেন? মারামারি করবি নাকি? তোদের ওখানে কে এক আই-বি-এম সিস্টেম ম্যানেজার এসেছে? রতন গাঙ্গুলী না, কি নাম।"

রতন গাঙ্গুলী। হ্যাঁ, মাস কয়েক হলো এই অফিসে এসেছে বটে এক ছোকরা। এক-একদিন একই অফিসের গাড়িতে ওরা অফিস থেকে ফিরছে। দু-একটা মিটিংয়েও দেখা হয়েছে পারমিতার সঙ্গে। মুখচোখ বেশ ব্রাইট। বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। কিন্তু রতন গাঙ্গুলীকে নিয়ে অফিসে কিছু উত্তেজনাও হয়েছে। সন্তোখ সিং নামে এক ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপর গাঙ্গুলীকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অফিসে বেশ কিছু জল ঘোলা হয়েছে। সন্তোখ সিং কাস্টোডিয়ানের সঙ্গে দেখাও করেছিল। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। লোকটার ব্যক্তিগত রেকর্ড মোটেই ভাল নয়। মাতাল এবং চরিত্রহীন বলেও রিপোর্ট আছে। কাজকর্মেও মন নেই সন্তোখ

সিং-এর।

"রতন ছেলেটি সত্যই রতন শুনছি। তুই ওকে একটু সবুজ সংকেত দে।"

অপুর প্রস্তাবের কোনো উত্তর দিলো না পারমিতা। মনে পড়লো, তার প্রথম প্রেমের ব্যাপারে অপুই ছিল প্রধান পরামর্শদাত্রী। অপু বলেছিল, "দেবপ্রিয় যখন, তখন দেবীপ্রিয় হতেও বা বাধা কী।"

পারমিতা তখন অনভিজ্ঞ নবযৌবনা। দেবপ্রিয়কে দেখবার জন্যে শরীর ও মনের মধ্যে এক বিচিত্র অস্থিরতা অনুভব করতো। একদিন শনিবার দুপুরে পারমিতা প্রায় তিন ঘন্টা ঔৎসুক্যে অপেক্ষা করছিল—কখন সাইকেলের বেল বাজবে। কিন্তু কোথায় দেবপ্রিয়? সন্ধেবেলায় অপু এসেছিল বেড়াতে। জিজ্ঞেস করেছিল, "কীরে, অমন মুখ শুকিয়ে বসে আছিস কেন।"

লজ্জা কাটিয়ে বান্ধবীকে পারমিতা জিজ্ঞেস করেছিল, "কাউকে দেখবার জন্যে মন ছটফট করে কেন রে?"

অপু তখন গাদা গাদা বাংলা নভেল পড়ে অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। বলেছিল, "মানুষটি যদি পুরুষ হয় তা হলে বুঝতে হবে—প্রেম।"

প্রেম! নিষিদ্ধ রোমাঞ্চকর ওই শব্দটা পারমিতার শরীরে শিহরণ তুলেছিল।

দেবপ্রিয়র সঙ্গে মনের আদান-প্রদান যখন বেশ জমে উঠেছে, অপু তখন তার নভেল-পড়া অভিজ্ঞতা থেকে মিতাকে অনেক জ্ঞান দিয়েছে। বলেছে, "তোর অঙ্গে-অঙ্গে অস্থিরতা দেখছি, ওহে ঝাঁকড়া চুলের চণ্ডালিনী!" অপুই পরামর্শ দিয়েছিল, "একটু সাজগোজ কর! বসনেভূষণে যৌবনকে মূল্যবান করার চেষ্টা কোথায়?"

চোখ দুটি ঈষৎ বিকশিত করে মৃদু ও মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলেছিল পারমিতা। অপু বলেছিল, "নভেলে লিখেছে, হাসি হচ্ছে কামদেবের ধনু। তোর হাসিটা মারাত্মক।"

প্রচণ্ড বকুনি লাগিয়েছিল পারমিতা। রসিকতা করে অপু জিজ্ঞেস

করেছিল, "দেবপ্রিয়কে তো ওরকম বকুনি দিতে পারবি না।"

"কেন পারবো না? গত শনিবার দিয়েছি। দেড়ঘন্টা লেট করে কলেজ থেকে ফিরলো। টগর-পুকুরের ধারে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ও যখন কথা বলতে এলো, তখন আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাইনি। বলেছি, তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না।"

অপু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, "দাঁড়া, দাঁড়া! প্রেমশাস্ত্রে এর নাম বিভ্রম। প্রিয়সমাগমে স্ত্রীলোকের প্রথম যে প্রণয় বাক্য স্ফুরিত হয় তার নাম বিভ্রম।"

"আমি ওকে মোটেই তোয়াক্কা করি না," পারমিতা ঘোষণা করেছিল।

হেসে ফেলে অপু বলেছিল, "নভেলে যা লেখে তা মিথ্যা নয় দেখছি। মেয়েমানুষদের এই ভাবের নাম বিব্বোক—অহঙ্কারবশে মেয়েরা এই অবস্থায় প্রিয়বস্তুর অনাদর প্রকাশ করে।"

এই মুহূর্তে পারমিতা কিছুক্ষণের জন্য অতীত পরিক্রমা করে এলো। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল বৃথা হয়েছে পারমিতার। বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণের বদলে পারমিতা কী পেয়েছিল, সে কথা অপু অন্তত ভালভাবে জানে এবং অপুর মনে আছে সেই নরম মেয়েটা পরাজয়ের আগুনে পুড়ে একেবারেই পাল্টে গেলো।

অপু বললো, "যখন রক্ত গরম ছিল, তখন ভাবতুম ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কম যায় কীসে? এখন ভাই আমার কর্মজীবনের কথা ভাবতেই ইচ্ছে করে না।"

"তুই বলছিস, মেয়েরা হাতা-খুন্তি হাতে আবার অন্দরমহলে পশ্চাদপসরণ করুক?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"হোস্টেলে থেকে তুই যে একেবারে মেয়ে-মিলিটারি বনে গেলি!" বললো অপু।

"হোস্টেল আছে বলে তবু কিছু মেয়ে এই শহুরে-জঙ্গলে রাত কাটাতে পারছে। একলা কোনো মেয়ের পক্ষে এখানে ঘর ভাড়া করে থাকা

নাকি প্রায় অসম্ভব।"

অপু বললো, "অন্তত আইবুড়ো মেয়েদের পক্ষে সেটা ভাল কথা নয় মিতা। কষ্ট হলেও তুই হোস্টেলে থেকে যা।"

পারমিতা বললো, "কাজকর্ম পাওয়াটাই মেয়েদের পক্ষে এক কঠিন ব্যাপার। তারপর কাজ যদি বা পাওয়া গেলো, কোথায় মাথা গুঁজবে? তাছাড়া সব সময় মনে রাখতে হবে, এদেশের শহরগুলো পুরুষমানুষদের—এবং তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ!"

আগেকার দিন হলে অপু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠতো। বলতো, "এইভাবে মেয়েরা কোনোদিন তো স্বাধীন হতে পারবে না। যে সিস্টেমে মেয়েদের পক্ষে নিজের খুশী মতো একলা থাকবার ব্যবস্থা নেই—সঙ্গে বাবা, দাদা, ছেলে ইত্যাদি একটার 'কেয়ার-অফ' দরকার সেখানে বুঝতে হবে মেয়েদের শিকল ছেঁড়েনি।"

কিন্তু অপু সিঁথিতে লাল সিঁদুরের লাইসেন্স পেয়ে নিজের একটা হিল্লে করে ফেলেছে—সে আর কোনোরকম গোলমালে যেতে চায় না। আবহমানকাল ধরে এদেশে যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাতেই সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

অপর্ণাকে উত্তেজিত করে লাভ নেই। ঘর সংসারের নেশায় সে এখন বুঁদ হয়ে আছে, পারমিতা ভাবলো। পরিস্থিতিটা হাল্কা করবার জন্যে সে বললো, "তোর বরের এখনও দেখা নেই।"

অপু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললো, "কোথায় অফিসের কোন ধান্দায় ঘুরছে। দিশী কোম্পানি তো, উঁচু পোস্টে বাঙালীদের রাখতেই চায় না। নিজের যোগ্যতা দেখাবার জন্যে বেচারাকে তাই ডবল খাটতে হয়।"

পারমিতা হেসে বললো, "সব সময় বরকে অত ডিফেন্ড করিস না। অফিসে কাজের নাম করে ছেলেরা অনেক সময় স্রেফ আড্ডা মারে, না-হয় মদ খায়। আমি অফিসের হাঁড়ির সব খবর জেনে ফেলেছি।"

অপু বললো, "মদ খায় সে তো মুখের গন্ধ থেকেই বুঝতে পারি। কিন্তু মদ খেতে-খেতেই যে ওর কাজ। গভরমেন্ট অফিসের নানা লোককে

সন্তুষ্ট করতে হয় ওকে। মদ না খাওয়ালে আজকাল কেউ মুখই খোলে না।"

কর্তা ফিরলেন বিকেল বেলায়। স্ত্রীর বান্ধবীর কাছে জোড়হস্তে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, "আপনি আসবেন শুনে তো ক'দিন থেকে অপু ছটফট করছে। একদিকে পালিয়ে গিয়ে ভালই করেছি, কারণ পরিমল রায়ের বইতে পড়েছিলাম, বাল্য বয়সের বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে মেয়েদের আর স্বামী পুত্র সংসার কিছুই খেয়াল থাকে না!"

"তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো বলে বেচারাকে কতক্ষণ আটকে রেখেছি," অপু বললো।

"আর বলো কেন, মুশকিল। দুজন গভরমেন্ট অফিসার নিজে থেকে বললেন কোথাও একটা সেশনের ব্যবস্থা করুন। নিজে মুখ থেকে বলছেন, খাওয়ান। সুতরাং আমার কোনো পথ নেই। কিন্তু দুপুর সাড়ে বারোটায় রেস্তোরাঁয় বসে ওঁরা যে সন্ধে পৌনে ছ'টার আগে টেবিল ছাড়বেন না এমন ধারণা আমার ছিল না। ওঁদের বোধহয় আরও বসবার ইচ্ছে ছিল, আমি প্রায় জোর করে উঠে এলাম। কিন্তু বিশ্বাস করবেননা এঁরা এখনও 'আউট' হননি—মদের কারখানায় এঁদের চাকরি নেওয়া উচিত ছিল।"

মদের কথায় পারমিতার মনে পড়ে গেলো তার ককটেলের কথা। অপু বললো, "তুই এখান থেকে তৈরী হয়ে যা। আমার শাড়ি যেটা পছন্দ পর। আমার ব্লাউজও তোর গায়ে হয়ে যাবে।"

পারমিতার আপত্তি শুনলো না অপু। বললো, "কলেজে থিয়েটারের সময় কে তোকে সাজিয়ে দিতো মিতা?"

কর্তাকে বেডরুম থেকে বার করে দিয়ে অপু পারমিতাকে সাজিয়ে দিলো। পারমিতা বলেছিল, "বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি না অপু। এটা অফিসের ককটেল পার্টি।"

"অফিসের ককটেল পার্টি বিয়ে বাড়ির বাড়া। তুই যদি স্বামীর

সঙ্গে অফিসের পার্টিতে যেতিস তা হলে তোর স্বামীর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বেলা তিনটে থেকে সাজগোজ করতে হতো।"

"অপু, এখানে আমি কারুর হাত ধরে যাচ্ছি না—আমার নিজের জোরেই যাচ্ছি," পারমিতা মুখের বাড়তি পাউডার মুছতে মুছতে বললো।

অপু ওসব কথায় কান দিলো না। ফিনিশিং টাচ দিয়ে শিল্পী যেমনভাবে তাঁর ছবির দিকে একটু দূর থেকে তাকিয়ে দেখেন, সেইভাবে অপু সাজানো শেষ করে বান্ধবীর দিকে তাকালো। বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বললো, "যা দেখাচ্ছে না তোকে! ইংরিজিতে একেই বলে ড্রেসড্ টু কীল। হৃদয়-হত্যার জন্যে সাজগোজ!"

"রাখ রাখ অপু। খুন করাটা বেআইনী।"

বান্ধবীর ব্লাউজের তলাটা টানতে টানতে অপু বললো, "খুনের শাস্তি ফাঁসি! দুজনকে একসঙ্গে ছাদনাতলায় ঝুলিয়ে দেবো!"

অপুর গাড়িতে চড়েই পারমিতা মিস্টার ভেঙ্কটরমণের পার্টিতে চললো। গাড়িতে বসে, ফাঁসির কথাটা আবার মনে পড়লো। হৃদয়-হত্যার অপরাধে, ফাঁসির পরিবর্তে অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। সারাজীবন তারা জ্বলে পুড়ে মরে—আর নিঃসঙ্গ একটা খুপরির মধ্যে নিজের মনকে চিরদিনের জন্যে বন্দী করে রাখে।

সুতানুটি ক্লাবের দরজার কাছে মিস্টার ভেঙ্কটরমণ নিজেই পারমিতাকে অভ্যর্থনা করলেন। হল-এর ভিতর ঢুকতে-ঢুকতে মনের মধ্যে নতুন এক অনুভূতি গুনগুনিয়ে উঠলো। শীতলপুর টাউনে যে-মেয়ে একলা বাড়ি থেকে বেরোবার অনুমতি পেতো না, ছোট্ট কলেজে মাস্টারী করেই যে অনেকখানি হলো ভাবছিলো, সেই আজ একলা সুতানুটি ক্লাবের

ককটেলে অংশ নিতে এসেছে।

মিসেস ভেঙ্কটরমণ মিষ্টি হেসে পারমিতাকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু পারমিতাকে কেন্দ্র করে যে প্রোটোকল সমস্যা হয়েছিল তা চেপে গেলেন। মিস্টার ভেঙ্কটরমণ বলেছিলেন, সমস্ত অফিসারদের নিমন্ত্রণ করতে। পি-এ জিজ্ঞেস করেছিল মিস্টার্‌ এন্ড মিসেস? ভেঙ্কটরমণ বলেছিলেন, শুধু মিস্টারদের। কার্ড ছাড়া হয়ে যাবার পরে, আর-এস ভি-পি'র তালিকায় চোখ বুলোতে গিয়ে মিস্টার ভেঙ্কটরমণ পারমিতার নাম দেখলেন। বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন তিনি। স্ট্যাগ পার্টিতে মহিলা। প্রোটোকল অনুযায়ী ভীষণ বিপত্তি। প্রথমে ভাবলেন, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন পার্টির একমাত্র মহিলা অতিথিকে সান্নিধ্য দেবার জন্যে। ফোনে পরামর্শ চাইলে প্রোটোকল-বিশারদ গৃহিণী প্রবল আপত্তি জানালেন—ক্যালকাটার সভ্য সমাজে এরকম নাকি করাই হয় না। "গৃহস্বামী নিজের বউটি নিয়ে পার্টি করবেন, আর সকলে বউকে বাড়িতে ফেলে রেখে আঙুল চুষবেন তা হয় না।" সুজন দাশগুপ্ত, সেন ইত্যাদি কয়েকজনের বউকে বললে কী হয়? প্রশ্ন করেছিলেন ভেঙ্কটরমণ। তাও চলে না। অফিসে বিভিন্ন লোকের জন্যে বিভিন্ন ব্যবহার মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না—আবার কোনো সিরিয়াস গুজব রটবে। এরপর সবাইকে জনে জনে 'শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী' কার্ড পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে সেক্রেটারির ভুলেই প্রথম কার্ডটা পাঠানো হয়েছিল।

সুজন দাশগুপ্ত একটা হুইস্কির গেলাস হাতে ব্যাংকোয়েট হল্‌-এর এক কোণে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছেই প্রথম থামলো পারমিতা। সুজন জিজ্ঞেস করলেন, "কী নেবেন মিস মুখার্জি? দিশী হুইস্কি পছন্দ করেন? হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে ঢোকা পর্যন্ত স্কচ খেয়ে খেয়ে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আর কিছু সহ্য করতে পারি না। কোম্পানির পার্টিতে যে কোনোদিন দিশী হুইস্কি সার্ভ হবে, এ আমরা কল্পনাও করিনি।"

মিষ্টি হেসে পারমিতা বললো, "হুইস্কি নয়।"

বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়াতে সুজন বললেন, "তা হলে আপনাকে

একটা জিন দিক—এই জিনিসটা ইন্ডিয়াতে বেশ ভালই তৈরি হচ্ছে।"

পারমিতা এবারও আপত্তি করতে সুজন বললেন, "বেশ বেশ, আপনাকে ড্রিংক করতে হবে না—আপনি স্রেফ একটা ব্রান্ডি নিন। ব্রান্ডিটা মদই নয়—স্রেফ ওষুধ!"

পারমিতা একটা কোকাকোলার গেলাস হাতে তুলে নিলো। সুজন দাশগুপ্ত সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "আপনারা হাসালেন, মিস মুখার্জি। স্কচ হুইস্কি কালচারকে কুইট ইন্ডিয়া করিয়ে আপনারা শেষ পর্যন্ত আমেরিকান কোকাকোলা কালচারকে এদেশে কায়েম করুন এটা নিশ্চয় গভরমেন্টের পলিসি নয়। স্কচের বদলে রাশিয়ান ভদকাতে সুইচ ওভার করলে তবুও একটা মানে হয়।"

প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের জয়ন্ত সেন এবার পারমিতার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "একই অফিসে কাজ করছি তবু আপনার সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়নি।"

"অফিসে কাজ নিয়ে সবাই ব্যস্ত—ওখানে কি আর তেমন জানাশোনা হয়? সেই জন্যেই তো এই ধরনের পার্টি প্রয়োজন।" বললেন সুজন দাশগুপ্ত।

জয়ন্ত সেন বললেন, "আগে এই ধরনের পার্টি মাসে দুটো তিনটে লেগে থাকতো।"

"সে ওয়াজ আপন এ টাইম, মিস মুখার্জি। রুগ্ন ইন্ডাসট্রির খাতায় নাম লিখিয়ে হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার অফিসারদের মান-ইজ্জত-ধর্ম সব গঙ্গা জলে বিসর্জন দিতে হয়েছে।"

"কেন?" মৃদু হেসে পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস মুখার্জি—কোম্পানি রুগ্ন হওয়া মানেই গভরমেন্টের খপ্পরে পড়া। গভরমেন্ট গাঁটের পয়সা খরচ করে আপনাকে দাওয়াই খাওয়াবে না—তারা বড় জোর মাছের তেলে মাছ ভাজবার চেষ্টা করবে!"

"সেটা তো কিছু অন্যায় নয়," জয়ন্ত সেন বলে ফেললেন।

হুইস্কির গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে সুজন দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন, "দোহাই, আর গভরমেন্টর ব্রোকারি করবেন না।"

"কেন, গভরমেন্টের আবার কী দোষ করলো?" মহিলার সামনে অপমানিত হয়ে জয়ন্ত সেন একটু গরম হয়ে পড়েছেন।

সুজন দাশগুপ্ত বললেন, "গভরমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গিটা হলো নিম্নমধ্যবিত্তের। তাঁরা জানেন না এইসব কলকারখানা ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে গেলে একটু উঁচু নজরের দরকার। তাই তাঁরা প্রথমেই অফিসারদের মেলামেশার সুযোগ-সুবিধে বন্ধ করে দেন।"

পারমিতার উপস্থিতির কথা সুজন দাশগুপ্ত যেন হঠাৎ খেয়াল করলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, মাঝে মাঝে মেজাজ খাপ্পা হয়ে যায়। পার্টিতে এসে আমরা কোম্পানিরই কাজ করতাম। ঘরের মদ খেয়ে আমরা আপিসের মোষ তাড়াবো, এটা আশা করা যায় না নিশ্চয়।"

সুজন দাশগুপ্তকে এড়িয়ে পারমিতা একটু এগিয়ে গেলো। সামনের দলেও শুধু আপিস সম্বন্ধে আলোচনা। কানু বিনা গীত এদের জানা নেই।

রতন গাঙ্গুলী এবার কাছে এসে দাঁড়ালো। সুদর্শন রতন নিখুঁত ড্রেস করেছে—ঘন নীল সুটের সঙ্গে লাল টাই পরেছে। কোটের পকেট থেকে লাল রংয়ের রুমাল উঁকি মারছে। বিখ্যাত এক ফরাসী সেন্টের গন্ধ রতনের দেহ থেকে ভেসে আসছে। রতন গাঙ্গুলী হেসে বললো, "এই ধরনের পার্টি আপনার বোধহয় মোটেই ভাল লাগবে না।"

হাসলো পারমিতা। "এখনও পর্যন্ত খারাপ লাগছে না।"

রতন বললো, "পেটে কিছুটা অ্যালকোহল না পড়লে, এই ধরনের সার্কাস পার্টি অনর্থক মনে হয়।"

পারমিতা বললো, "আমার এই প্রথম পার্টি, তাই বেশ ভাল লাগছে।"

রতন বললো, "শিকাগো এবং নিউ ইয়র্কে ছ'বছর কাজ করেছি,

তারপর দু' বছর প্যারিতেও পোস্টিং পেয়েছিলাম। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দুনিয়ার সমস্ত মার্চেন্ট আপিসের লোকগুলো এক ছাঁচে ঢালা। এদের মধ্যে কোথাও মস্ত ফাঁকি আছে। অনেকটা আমাদের এই কোটের রুমালের মতো—দেখলে মনে হবে একটা পুরো রুমাল সযত্নে ভাঁজ করা আছে। কিন্তু আসলে ফল্‌স"—এই বলে নিজের পকেট থেকে রুমালখানা তুলে ফেললো রতন গাঙ্গুলী। পারমিতা জানতো না রুমালও ফল্‌স হয়—একটা মোটা কাগজের ওপর কয়েক ভাঁজ কাপড় সেলাই করা আছে—রুমালের নাম গন্ধ নেই।

রতন গাঙ্গুলী বেশি কথা বলে না। মেয়েদের সম্পর্কে তার সৌজন্যবোধ আছে যথেষ্ট। ড্রিংকসের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বললো, "আপনি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাতায়াত করেন?"

মিষ্টি হেসে পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "আপনি জানলেন কী করে?"

রতন বললো, "সেদিন আলিপুর দিয়ে যাচ্ছিলাম—দেখলাম আপনি লাইব্রেরির গেট দিয়ে বেরোচ্ছেন। ভাবলাম একবার গাড়ি থামাই। তারপর মনে হলো, আপনার অন্য কোনো প্রোগ্রাম থাকতে পারে।"

পারমিতা বললো, "কলকাতা শহরের কিছুই জানি না—তাই ছুটির দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াই, না হয় লাইব্রেরিতে গিয়ে বাঙলা বইপত্তর নাড়াচাড়া করি।"

রতন গাঙ্গুলী একটু আগ্রহ দেখালো। "বহুকাল দেশছাড়া হয়ে আমারও একই অবস্থা—এখানকার সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই চলে। আমিও ভাবছি এবার একটু পড়াশোনা করবো।"

রতন গাঙ্গুলী সত্যিই কি পড়াশোনা করতে চায়? না, পারমিতার জন্যেই ছুটির দিনে দুপুরে লাইব্রেরিতে আসতে আগ্রহী? পারমিতা হয়তো আরও মাথা ঘামাতো, কিন্তু অন্য অনেক অতিথি হাজির হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হতে লাগলো। হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার কারখানা কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়। লোকাল ট্রেনে ঘন্টাখানেকের পথ। তারপর স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক মাইল, কারখানার অনেকেই এসেছেন।

অনেকের মধ্যেই একটু উত্তেজনা। অনেকদিন এই ধরনের পার্টি বন্ধ ছিল। হঠাৎ কর্তাদের পার্টিতে নিমন্ত্রণ হলে আশঙ্কা হয় কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউনসমেন্ট হবে। হেড অফিসের লোকদের অনেকেই ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছে, "কিছু খবর আছে নাকি?"

মহিলারা এক কোণে জটলা পাকাচ্ছিলেন। তাঁদের অনেকের হাতে টমাটো রস। আবার অনেকে হুইস্কির গেলাস ধরেছেন। বৃন্দা দাশগুপ্তা বললেন, "আমি একদম ড্রিংকস খেতুম না। শেষে মিস্টার জেনকিন্স একদিন জোর করে একটু খাইয়ে দিলেন। ওঁরই ফেয়ারওয়েল পার্টিতে বললেন, 'ফর মাই সেক একটু টেস্ট করো।' না বলতে পারলাম না। এবং খেয়ে দেখলুম মন্দ নয়—অনেক আজে বাজে চিন্তা ভোলা যায়।"

মিসেস ভেঙ্কটরমণ বললেন, "লেডিজ, তোমরা লজ্জা পেয়ো না। কনস্টিটিউশনের কোথাও লেখা নেই মেয়েরা ড্রিংকস করতে পারবে না বা স্মোক করবে না। তোমরা ওইসব টমাটো রস দিয়ে পেট বোঝাই কোরো না।"

মহিলারা খিল খিল করে হেসে উঠলো। দামী শাড়ি এবং মণিমাণিক্যখচিত এই সব মহিলাদের সঙ্গে পারমিতা ঠিক মিশতে পারছে না। কোথাও যেন একটা দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। কারখানার দু-একজন অফিসার-গৃহিণী পারমিতাকে ঠিক বুঝতেও পারেনি। মিসেস বাসু বোকার মতো জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার স্বামী হেড অফিসে কাজ করেন বুঝি?"

বৃন্দা দাশগুপ্ত জিভ কেটে বললো, "কী বলছেন? উনি নিজেই হেড অফিসের হোমরা-চোমরা অফিসার। কারও গিন্নী নন।"

"ওমা, সত্যিই তো, মাথায় সিঁদুর নেই, আমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল," মিসেস বাসু ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

বৃন্দা বললো, "এঁদেরই তো যুগ এখন। আমার কর্তা তো উঠতে বসতে খোঁটা লাগাচ্ছেন ঘরে বসে না থেকে একটা কাজকর্ম করো।"

"ঘর সংসার দেখাটা কাজকর্ম নয় বুঝি?" প্রশ্ন করলেন মিসেস বাসু।

"পুরুষমানুষদের তাই তো ধারণা। আমরা নাকি অপদার্থ, সমস্ত দিন আমাদের যা আউটপুট, কারখানার কাজ করলে নাকি চাকরি থাকতো না।"

"চাকরি থেকে ছাঁটাই করবার ইচ্ছে বুঝি?" মিসেস বাসু ফোড়ন দিলেন। "দেখুক না কয়েকদিন ঘরসংসার—কত ধানে কত চাল বুঝবে।"

এবার আর-এক মহিলা এসে দলে যোগ দিলেন। মিসেস বাসু বললেন, "ইনি মিসেস রায়—এঁর কর্তাটি হচ্ছেন প্ল্যান্ট ইনজিনীয়ার।"

পারমিতার সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে মিসেস মণিকা রায় বললেন, "মিসেস বাসুর কর্তাটি হচ্ছেন প্রোডাকশন ইনজিনীয়ার। ফলে আমাদের দুজনের স্বামীদের অহি-নকুল সম্পর্ক। ইনি বলেন, তোমার লোকজন মেশিন চালাতে জানে না।"

"আমরা দুজনে কিন্তু বেস্ট ফ্রেন্ড," ঘোষণা করলেন মিসেস বাসু।

মণিকা রায় বললেন, "বিশেষ কারণে দেরি হয়ে গেলো।"

ফিক করে হেসে মিসেস বাসু বললেন, "বিশেষ কারণটা, বুঝতেই পারছেন—ওঁদের বিবাহবার্ষিকী!"

মণিকা রায় সলজ্জভাবে হাসলেন, বললেন, "নেহাত হেড আপিসের পার্টি, তাই আসতেই হলো।"

"আমি হলে কিছুতেই আসতাম না," ঘোষণা করলেন মিসেস বাসু। "বর আগে, না, কোম্পানির পার্টি আগে?"

সুন্দরী ও সুসজ্জিতা মণিকা রায় নিজের শাড়ির আঁচল সামলে বললেন, "বরের চাকরি আগে না ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি আগে বলুন? যা বাজার তাতে বউ গেলে বউ হবে, কিন্তু চাকরি গেলে চাকরি হবে না।"

মিসেস বাসু বললেন, "বরের সঙ্গে আপনি আরও একশ বছর ঘরসংসার করুন। এই আমাদের প্রার্থনা, কী বলুন?" এই বলে পারমিতার দিকে তাকালেন তিনি।

পারমিতাও সায় দিয়ে বললো, "অবশ্যই। রজত জয়ন্তী, সুবর্ণ

জয়ন্তী, হীরক জয়ন্তী ইত্যাদির দিকে অন্তত এগিয়ে যান।"

মণিকা রায় এবার পারমিতার সঙ্গে বেশ জমে গেলেন। বললেন, "কারখানার দিকে আসেন না আপনি?"

"ওদিকে এখনও তেমন কাজ পড়েনি," পারমিতা জানালো। মণিকা বললো, "আসুন না একটা কাজের ছুতো নিয়ে। আমাদের টাউনশিপটা আপনার ভাল লাগবে।"

পারমিতা বললো, "হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে যখন ঢুকেছি, তখন কারখানায় নিশ্চয় যাবো।"

মণিকা রায় জানালেন, "একটা কন্ডিশন রইলো—গেলে আমার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন, এবং যদি রাত কাটান তা হলে তো কথাই নেই।"

ধন্যবাদ জানালো পারমিতা। কারখানা বাড়াবার জন্যে নানা পরিকল্পনা চলছে—একবার নিজের চোখে জায়গাটা দেখা থাকলে সুবিধে হয়। সুদর্শন চৌধুরী অবশ্য নিজে ঢালাও অনুমতি দিয়ে রেখেছেন—যখন খুশী সে যেতে পারে।

মণিকা বললো, "মিস্টার রায়ের সঙ্গে আপনার একটু আলাপ করিয়ে দেবো।" এই বলে স্বামীকে খোঁজ করতে লাগলেন মিসেস রায়। মিসেস বোস টিপ্পনী কাটলেন, "অত ছটফটানি কেন, মিসেস রায়? ভয় নেই, বিবাহ-বার্ষিকীর রাতে বর অন্য কোনো মেয়ের হাত ধরে পালাবেন না—কোথাও ভিড়ের মধ্যে রয়েছেন।"

মণিকা রায়ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আপনার মতো রূপের দড়ি দিয়ে সবাই তো স্বামীকে বেঁধে রাখতে পারে না। আমাদের মতো অর্ডিনারি মেয়েদের সব সময় কড়া নজর রাখতে হয় স্বামীর ওপর।"

পারমিতা হেসে ফেললো। মণিকা সঙ্গে সঙ্গে বললো, "হাসবেন না—একদিন না একদিন একটি স্বামীদেবতা তো জুটবে, তখন বুঝবেন স্বামী সামলানো কী অশান্তির কাজ।"

"তা সত্যি। স্বামী মানেই আসামী। চান্স পেলেই ফেরারী হয়ে যাবার

বাসনা থাকে অনেকের," মন্তব্য করলেন মিসেস বাসু।

স্বামীকে খোঁজবার জন্যে মণিকা রায় এবার দলত্যাগ করলেন। ঠিক সেই সময় ঘরে চাপা আলোড়ন উঠলো। স্বয়ং সুদর্শন চৌধুরী কিছুটা বিলম্বে হলেও আসরে উপস্থিত হয়েছেন। সুদর্শনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছাড়াও একজন ছোকরা বিদেশীকে দেখা যাচ্ছে। মিসেস চৌধুরী এগিয়ে এসে মহিলামহলে যোগ দিলেন।

সুদর্শন চৌধুরী বিলেত থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে নাকি এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন তাই দেরী হয়ে গেলো।

পারমিতাকে দেখতে পেয়ে সুদর্শন চৌধুরী তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, "তোমার সঙ্গে অনেক কাজ আছে আমার। ফ্যাকটরিতে একটা গোপন তদন্ত আছে। আমি তোমাকে দায়িত্বটা দিতে চাই। পারবে?" জিজ্ঞেস করলেন সুদর্শন।

"আপনি সাহায্য করলে নিশ্চয় পারবো," বললো পারমিতা।

"কাল সকালে তোমাকে ফাইলটা দিয়ে দেবো।" সুদর্শন চৌধুরী আরও বললেন, "তোমাকে সেই ফরেন টেকনিক্যাল কোলাবরেশনের কথা বলেছিলাম, ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়েছে। টেলিগ্রাম পেয়েই এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। বিলিতী কোম্পানীর মিস্টার এন্টনি মায়ার বিস্তারিত আলোচনার জন্যে এসেছেন। হোটেলে মালপত্র রেখে ওঁকে নিয়ে এখানে এলাম। আমাদের অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় হোক।"

পারমিতা দেখলো এন্টনি মায়ার দূরে দাঁড়িয়ে মিস্টার ভেঙ্কটরমণ ও সুজন দাশগুপ্তর সঙ্গে কথা বলছেন।

মণিকা রায়ের সঙ্গে পারমিতার আবার দেখা হয়ে গেলো। ককটেল পার্টিতে এই লুকোচুরি খেলাটা বেশ জমে। এই কারোর সঙ্গে প্রচণ্ড আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, হঠাৎ এক্সকিউজ মি বলে কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে তিনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

মণিকা বললো, "আমার স্বামীকে এক কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে আপনাকে খুঁজতে এসেছি।"

যেন সুইচে হাত দিতে গিয়ে হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক লাগলো। পারমিতার সমস্ত শরীর অনেকদিন পরে হঠাৎ শিরশির করে উঠলো। মণিকা রায় কার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিতে চাইছে? মণিকা বলছে, "ইনিই আমার স্বামী দেবপ্রিয় রায়।" দেবপ্রিয়.....দেবপ্রিয়.....দেবপ্রিয়.....হা ঈশ্বর! দেবপ্রিয় রায়ের সঙ্গে পারমিতা মুখার্জির আলাপ করিয়ে দিচ্ছে কোথাকার কে একটা মেয়ে।

পৃথিবীটা তা হলে সত্যিই খুব বড় জায়গা নয়। সময়ের আবর্তে পাক খেতে খেতে পারমিতা মুখার্জি ও দেবপ্রিয় রায়ের মধ্যে আবার সাক্ষাৎ সম্ভব। ঈশ্বরের কী এক কৌতুকে দেবপ্রিয় এবং পারমিতা শেষ পর্যন্ত একই অফিসে চাকরি করতে এসেছে।

পারমিতা এখন কী করবে? কীরকম ব্যবহার করবে সে? ঝকঝকে সুট পরা দেবপ্রিয় রায়ই বা এখন কী করবে? দেবপ্রিয় রায় বোধহয় নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে হাত তুলে নমস্কার করলো।

তারপর কী যে হলো পারমিতার নিজের খেয়াল নেই। কোনোরকমে একটা প্রতিনমস্কার জানিয়ে সে ওখান থেকে সরে এসেছে। সম্ভব হলে তখনই ওই পার্টি থেকে পালিয়ে আসতো।

"কী হলো আপনার? ঘামছেন মনে হচ্ছে?" রতন গাঙ্গুলী এগিয়ে এসে পারমিতাকে প্রশ্ন করলো।

পারমিতা কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। রতন গাঙ্গুলী নিজেই অবশ্য অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচালো। "আপনি বোধহয় সিগারেটের ধোঁয়ায় অভ্যস্ত নন। এক ঘন্টা ধরে সবাই স্মোক করার দরুন ঘরটা কিরকম গুমোট লাগছে।"

অস্বস্তি এড়াবার সুযোগ পেয়ে পারমিতা বেশ খুশী হলো। বললো, "এখনই ঠিক হয়ে যাবে।"

"আপনার গেলাস খালি, কিছু একটা নিন," রতন গাঙ্গুলী অনুরোধ করলো।

তারপর রতন গাঙ্গুলী অবাক হয়ে দেখলো পারমিতা একটা জিনের

গেলাস তুলে নিয়েছে।

রতন গাঙ্গুলী নিজেও একটু আশ্বস্ত হলো। গোটা চারেক বড়ো হুইস্কি দ্রুত নিঃশেষ করে সে একটু বেসামাল বোধ করছিল।

অনভ্যস্ত পারমিতা নিজের গেলাসটা দ্রুত খালি করে ফেললো। সে এখন ভাবার চেষ্টা করছে, দেবপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হবার পরে ঠিক কি ঘটেছিল। দেবপ্রিয় তাকে কি 'আপনি' বলেছিল?

ওদিকে মহিলামহলে বৃন্দা দাশগুপ্তা খিলখিল করে হাসি শুরু করেছে। "খুব গুড গার্ল সেজে বসেছিল পারমিতা মুখার্জি। এখন মুখোস খুলে পড়েছে। সামনে ড্রিংকসের ছড়াছড়ি দেখলে কতক্ষণ সংযম থাকতে পারে?"

মিসেস বাসু বললেন, "অথচ এতোক্ষণ আমাদের সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।"

বৃন্দা দাশগুপ্তা বললো, "রাখুন ওসব অভিনয়। যে-মেয়ে অফিসের বড়কর্তাকে নাচিয়ে হুড়মুড় করে প্রমোশন আদায় করছে, তিনি আবার ড্রিংকসের অ-আ-ক-খ জানেন না। তাছাড়া মেয়ে হোস্টেলের কাণ্ড-কারখানা আমার জানতে বাকি নেই! বাড়ির বাইরে একলা ছাড়া পেলে মেয়েরাও আজকাল বাঘিনী বনে যায়।"

মণিকা রায়ও মোটেই সন্তুষ্ট নয় পারমিতার ওপর। সে ভাবছে, ভদ্রমহিলা তার স্বামীর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করলো। বড়সাহেবের নেকনজরে আছে বলে এতো ডাঁট ভাল নয়। দায়সারা একটা নমস্কার করে মেয়েটা ছিটকে বেরিয়ে গেলো। মণিকার সঙ্গেও আর কথা বললো না।

মিসেস বাসু দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। মনে মনে খুশী হয়েছেন তিনি। খোদ কর্তার স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট বলে, অত আদিখ্যেতা কেন? অত বিনয় দেখিয়ে, স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কী ফল হলো?

মণিকা বললো, "আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা চাকরিতে অতটা

স্ট্যাটাস কনসাস হয় না।"

"যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ," মন্তব্য করলেন মিসেস বাসু।

যাকে নিয়ে এতো জল্পনা-কল্পনা সে এখন তরুণ সুদর্শন দীর্ঘদেহী এন্টনি মায়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অনভ্যস্ত পেটে দু পেগ জিন পড়ে পারমিতা বেশ প্রগলভ হয়ে উঠেছে।

পারমিতার সমস্ত শরীরটা যেন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। পারমিতা ভেবেছিল, দেবপ্রিয় একবার অন্তত এদিকে আসবে। জিজ্ঞেস করবে, "কেমন আছো ?" জিজ্ঞেস করলেই যে সব সমস্যা মিটে যাবে তা নয়, দেবপ্রিয়কে ক্ষমা করা পারমিতার পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না। একটা তীব্র জ্বালায় পারমিতা অকস্মাৎ অসহনীয় কষ্ট পাচ্ছে।

সেসব তো কতদিন আগেকার কথা। মফস্বল টাউনের একটা অনভিজ্ঞ মেয়েকে তুমি যে চরম অসম্মান করেছিলে, তারপর সে একেবারে পাল্টে গিয়েছে। সে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। সে আর সেই লজ্জাবতী লতাটি নেই। নিজের ভাগ্য নিজে বুঝে নেবার মতো ক্ষমতা সে পেয়েছে। নিজের বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে মন্দিরের কাছে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে যে সাহস পেতো না সে এখন একলা ককটেল পার্টিতে আসছে।

এন্টনি মায়ার এই পার্টিতে কেন এসেছে তা পারমিতা ছাড়া কেউ জানেন না।

সুদর্শন চৌধুরী আলাপ করিয়ে দিলেন, "পারমিতা, মিঃ মায়ার।" সুদর্শন চৌধুরী আরও জানালেন, মিস্টার মায়ার শুধু বিশিষ্ট ইনজিনীয়ার নন—বিভিন্ন বিষয়ে ওঁর আগ্রহ, বিশেষ করে ছবি তোলায়। এন্টনিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পারমিতা বললো, "তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম।"

টোনি বললো, "আপনার মতো সুন্দরী মহিলার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যটা আমারই।"

পারমিতা লক্ষ্য করলো টোনির মনটা এখনও ভারতবর্ষের

কলোনিয়াল আবহাওয়ায় বিষাক্ত হয়ে ওঠেনি। কোন অফিসে কে কি পোস্টে চাকরি করে সেই অনুযায়ী চিবিয়ে ভদ্রতা করার বা দূরত্ব রাখার দুর্বুদ্ধি এখনও ছোকরার মাথায় ঢোকেনি।

পারমিতা প্রশ্ন করলো, "এই কি প্রথম ভারতবর্ষে এলে?"

টোনি ওর সোনালী চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বললো, "একত্রিশ বছর আগে ভারতবর্ষের এই শহরেই আমি জন্মেছিলাম। আমার বাবা তখন কলকাতায় চাকরী করতেন। জন্মভূমি দেখবার সুযোগ পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় আসতে রাজী হয়ে গেলাম।"

"কলকাতার ওপর তোমার দাবী তা হলে আমার থেকেও বেশী," বললো পারমিতা। "কারণ আমি এখানে জন্মাইনি—কয়েক মাস হলো বাইরে থেকে চাকরি করতে এসেছি।"

টোনি রসিকতা করলো, "চিন্তা কোরো না, অ্যাজ এ স্পেশাল কেস তোমাকে আমাদের এই শহরে যতদিন খুশি থাকতে অনুমতি দিলাম।"

টোনিকে পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "ছোটবেলার কোন স্মৃতি তোমার মনে আছে?"

দুষ্টুমি করে চোখ টিপে টোনি বললো, "অবশ্যই—মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া ব্রীজ, গভরমেন্ট হাউস, সব মনে আছে।"

বেশ অবাক হয়ে গেলো পারমিতা। টোনি তখন বললো, "কিছু মনে কোরো না। তোমার সঙ্গে রসিকতা করছিলাম। বাবা হঠাৎ কলকাতায় মারা গেলেন, আমি সেই তিনবছর বয়সে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছি, স্মৃতিতে কিছুই নেই। আমার এক বাঙালী আয়া ছিলেন—শুধু অস্পষ্টভাবে তাঁর কথা মনে পড়ে। শি ওয়াজ এ চার্মিং লেডি।"

পারমিতার উচিত এক জায়গায় অনেকক্ষণ না-কাটিয়ে সবার সঙ্গে মেলামেশা করা।

কিন্তু ঘরের এই কোণ থেকে তার নড়তে সাহস হচ্ছে না। পারমিতার

ভয় হচ্ছে এখনই তাকে আবার দেবপ্রিয়র মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু দেবপ্রিয়র সঙ্গে কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই তার। পারমিতা আন্দাজ করছিল, দেবপ্রিয় নিজেই তার খোঁজে অতিথিদের ভিড় ঠেলে এদিকে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কই সে তো এলো না।

ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়ে টোনি মায়ারের অনুসন্ধিৎসু চোখে অনেক প্রশ্ন জেগে উঠেছে। টোনি সবিস্ময়ে পারমিতার কাছে স্বীকার করলো, "ইউ ইন্ডিয়ান লেডিজ, তোমরা পৃথিবীর সব চেয়ে সুসজ্জিতা মহিলা। এমন রংয়ের রায়ট, এমন স্বর্ণালঙ্কারের সমারোহ পৃথিবীতে কোথাও আমি দেখিনি !"

পারমিতা চুপচাপ টোনির কথা শুনছে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করেনি। হঠাৎ টোনি জিজ্ঞেস করে বসলো, "তুমি এত সুন্দর শাড়ি পড়েছো, ওই সব লেডিজের মতো অলঙ্কার পরোনি কেন ?"

হেসে ফেললো পারমিতা। বললো, "সবাই সোনার শিকল পরতে নাও ভালবাসতে পারে !"

টোনি চোখ দুটো বড় বড় করলো। ঠোঁটের হাসি চেপে রেখে বললো, "বুঝেছি, তুমি বিদ্রোহিণী হবার চেষ্টা করছো। বোধহয় তুমি উইমেনস লিব-এ বিশ্বাস করো।"

পারমিতা জানে সমস্ত পশ্চিমে উইমেন্স লিব বা নারী স্বাধীনতা-সংগ্রামী কথাটার কদর্থ হয়েছে। এক শ্রেণীর খামখেয়ালী মহিলা স্বাধীনতার নামে—বিয়ের পরে স্বামীর গোত্র ব্যবহার করতে রাজী নয়, নামের আগে মিস বা মিসেস শব্দ ব্যবহারেও তাদের আপত্তি, তারা প্রসাধন করে না, এমনকি বক্ষবন্ধনী পরতেও তারা রাজী নয়। এই ধরনের স্বাধীনতা পারমিতা অবশ্যই চায় না। পারমিতা বললো, "ভারতবর্ষের মেয়েরা দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়, কামের বদলে তারা প্রেম চায়।"

টোনির মনে এখন অনেক প্রশ্ন। টোনি বললো, "তোমাকে নানা রকম কথা বলছি বলে বিরক্ত হচ্ছো না তো ?"

"মোটেই না," উত্তর দিলো পারমিতা। তারপর মুচকি হেসে বললো,

"হাজার হোক কলকাতা তোমার শহর, এবং আমি বাইরের লোক, সুতরাং আমাকে যথাসাধ্য সৌজন্য দেখাতেই হবে।"

পারমিতার রসিকতায় আনন্দিত টোনি মন্তব্য করলো, "কে বলে সুন্দরী মহিলাদের রসিকতা বোধ থাকে না?" টোনি বললো, "আমি লক্ষ্য করেছি মহিলারা কপালে এবং অন্যত্র লাল রংয়ের ডট অথবা লাইন টেনেছে। কালার ম্যাচিং-এর কোনো আইন ওখানে মানা হয়নি। শাড়ির রং জামার রং যাই হোক—ওই ডটের রং সব সময় লাল।"

পারমিতা খুব মজা পেলো। বললো, "মিস্টার মায়ার তোমার যা নজর, তাতে ব্যবসায় না এসে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ডিটেকটিভের চাকরি নেওয়া উচিত ছিল তোমার। ওখানে তোমার খুব নাম হতো।"

সুরসিক টোনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, "ইয়েস, চোর ডাকাত গুণ্ডাদের তাতে বিপদ হতো, কিন্তু আমার কি লাভ হতো? সব সময় পকেটমার, জোচ্চোর, খুনী পরিবৃত্ত হয়ে থাকতাম, এইসব ইন্ডিয়ান সুন্দরীদের সান্ধ্যসান্নিধ্য লাভের সুযোগ কোনোদিন পেতাম না।"

পারমিতা বললো, "আপনার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠবো না, এটা বুঝেছি। শুনুন ওই রেড ডটের কথা। ওটা মোটেই ডট নয়, সিঁদুর। কারুর কারুর কপালে যে গোল লাল ডট রয়েছে ওটা কিছু নয়—স্রেফ কসমেটিকস্। কিন্তু আসল ৪৪০ ভোল্টস ডেনজার সিগন্যাল হলো সিঁথির মধ্যে ওই লাল পাউডারের রেখাটা। ওর অর্থ মহিলাটি বিবাহিতা এবং তার স্বামী বহাল তবিয়তে আছেন।"

প্রাচ্যের কোনো এক গোপন রহস্যের চাবিকাটি যেন সে আবিষ্কার করেছে এমনভাবে উল্লসিত হয়ে উঠলো টোনি মায়ার। বললো, "কি ওয়ানডারফুল সিস্টেম। যে কোনো ইনডিভিজুয়ালের মুখের দিকে তাকিয়েই তার বৈবাহিক পরিস্থিতিটা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে, এমন দেশ পৃথিবীতে আর আছে বলে আমার জানা নেই।"

ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়ে টোনি মায়ার কয়েকজন মহিলাকে দূর থেকে যাচাই করলো। বললো, "সবার মাথাতেই ওই লাল বিপদ সংকেত দেখতে

পাচ্ছি। কিন্তু তোমার কপালে ওই ধরনের ট্রাডিশনাল কোনো মার্কা নেই। অবশ্য তুমি তো একজন বিদ্রোহিণী।"

পারমিতা প্রতিবাদ করলো। "এইসব যুগযুগান্তরের ট্রাডিশনের ব্যাপারে আমি মোটেই বিদ্রোহিণী নই।"

টোনি বললো, "তা হলে মানে দাঁড়াচ্ছে তোমার বিয়ে হয়নি অথবা".....এই পর্যন্ত বলে টোনি আচমকা ব্রেক কষলো।

"বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাইছিলে। হয় বিয়ে হয়নি, অথবা স্বামী অবর্তমান। স্বামীর অবর্তমানে এদেশের হিন্দু মেয়েরা সিঁদুর মুছে ফেলে এবং শাদা কাপড় পরে।"

টোনি একটু গোলমালে পড়ে গেলো। "আমাদের দেশে বিবাহের রং শাদা—মেয়েরা শাদা জামা পরে বিয়ে করতে আসে।"

"এখানে বৈধব্যের রং শাদা, বৈরাগ্যের রং গৈরিক, বিবাহের রং লাল।"

সুদর্শন চৌধুরী এই সময় ওঁদের কাছে ফিরে এসেছেন। পারমিতার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "বিবাহিত জীবনে অনেক খেয়োখেয়ি হবে, রক্তপাত হবে, তারই সময়মতো সংকেত-চিহ্ন বোধহয় এই লাল সিঁদুর।"

টোনি বললো, "মিস্টার চৌধুরী, আপনার স্পেশাল অ্যাসিসটেন্টের কাছ থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার আমি জানতে পারছি।"

সুদর্শন বললেন, "তুমি ভাল গাইডই পেয়েছো মিস্টার মায়ার। আমাদের দেশ সম্বন্ধে পারমিতা অনেক কিছু জানে। আমাদের নতুন যুগের মেয়েরাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই সভ্যতার আদর্শ সমন্বয় করতে পারে। এদের ওপরেই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এরা কুসুমের মতো কোমল হয়েও বজ্রের মতো কঠিন হতে পারে, সুন্দর হয়েও এরা সংহারমূর্তি ধারণ করতে পারে।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন সুদর্শন চৌধুরী। টোনি মায়ারকে বললেন,

"লম্বা প্লেন জার্নি করে এসেছো। যদি তুমি এখন ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে চাও, আমি তৈরি।"

টোনি এবার সুদর্শন চৌধুরীর সঙ্গে বিদায় নিলো। যাবার আগে সে পারমিতাকে শুভরাত্রি জানিয়ে গেলো।

জিনের নেশায় পারমিতার দেহ টলমল করছে। তার ইচ্ছে করছে এখনই ছুটে গিয়ে দেবপ্রিয় রায়ের গলার টাই চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে, "যাবার আগে একবার বলে যেতেও পারোনি? আমি বিশ্বাস করে তোমাকে সব দিতে চেয়েছিলাম—তোমার মনে যখন ওইসব ছিল তখন একটা নিরপরাধ মেয়েকে ঠকিয়েছিলে কেন? তার ভালবাসাকে এমনভাবে অপমান করবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছিল?" কিন্তু হল্‌ঘরের এই কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দেবপ্রিয় রায়কে খুঁজে বার করবার মতো ক্ষমতা সে তখন হারিয়ে ফেলেছে।

পারমিতা এবার একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিলো। পারমিতা বুঝতে পারছে চরম বিপদে পড়ে মানুষ কেন মদের আশ্রয় নেয়। সে নিজেও এই মুহূর্তে যেন হাওয়ায় ভেসে রয়েছে। আর একটু ড্রিংক করলে সে বোধহয় এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে পাখা মেলে উড়ে বেরিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু হঠাৎ পারমিতা আবার সংবিৎ ফিরে পাবার চেষ্টা করে। পার্টির লোকেরা কি বুঝতে পারছে যে পারমিতা মুখার্জি আজ মদ খেয়েছে?

সুতানুটি ক্লাবের ফয়ারে রতন গাঙ্গুলীর সঙ্গে পারমিতার আবার দেখা হলো। পার্টি ভাঙবার আগেই পারমিতা বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু রতন গাঙ্গুলীর নজর সে এড়াতে পারেনি। রতন বললো, "আপনি যাবেন কীসে?"

"আপনি চিন্তা করবেন না, একটা ট্যাক্সি ধরে নেবো," পারমিতা উত্তর দিলো।

"রাত দশটার সময় একলা মহিলা ট্যাক্সি চড়বেন, তা কখনই হয় না," রতন গাঙ্গুলী বললো।

হাসতে ইচ্ছে করছে পারমিতার। রতন গাঙ্গুলী এই কিছুদিন হলো ফরেন থেকে দেশে ফিরেছে ; কিন্তু এর মধ্যেই জেনে গিয়েছে, কলকাতা শহরে কোনো মহিলার পক্ষে রাত্রে একলা ট্যাক্সি চড়া নিরাপদ নয় ! এসব মিষ্টি কথা পারমিতার তখন ভাল লাগছে না। দেবপ্রিয়ও একদিন এমনিভাবে পারমিতা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করতো। দেবপ্রিয় তো সেবার একটা সাইকেল রিকশাওয়ালাকে জোর থাপ্পড় কষিয়েছিল। রিকশাওয়ালাটা দোষের মধ্যে সস্তা ফিল্মি প্রেমের গান গাইতে গাইতে গাড়ি চালাচ্ছিল। দেবপ্রিয় গঙ্গার ধারে পারমিতার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পারমিতা যখন সাইকেল রিকশা থেকে নামলো তখনও রিকশাওয়ালা ছোকরা গান ছাড়েনি। দেবপ্রিয় রুখে দাঁড়িয়ে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিল। "ইডিয়ট, ভদ্দর লোকের মেয়ের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো না ?"

দেবপ্রিয়র সাহস দেখে পারমিতা সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার প্রতি ভালবাসা আরও নিবিড় হয়েছিল—দেবপ্রিয় তা হলে সত্যিই পারমিতার জন্যে ভাবে, মনে হয়েছিল পারমিতার। দেবপ্রিয় বলেছিল, "এই যে একলা রিকশা চড়ে তুমি নদীর ধারে আমার জন্যে আসো, আমার খুব চিন্তা হয়।"

"তোমার সাইকেলের পিছনে চড়িয়ে নিয়ে এলেই পারো," পারমিতা বলেছিল। দেবপ্রিয়র যে তেমন অনিচ্ছা ছিল, তা নয়—কিন্তু মেয়েদের মান-সম্মানের কথা ভেবেই নাকি সে প্রস্তাবে উৎসাহ দেখায়নি।

রতন গাঙ্গুলী এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। "কী ভাবছেন, মিস মুখার্জি ?" রতন গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলো।

হাসলো পারমিতা। বললো, "ভাবছি, সুসভ্য এই শহরে মেয়েদের একলা ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা পুরুষমানুষেরা কেন কেড়ে নিয়েছে ?"

রতন গাঙ্গুলীও আজ একটু বেশি ড্রিংক করে ফেলেছে। সে বললো, "মিস মুখার্জি, আপনি খুব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলেছেন। শহরগুলো যেন পুরুষমানুষের জন্যে সৃষ্টি, মেয়েদের এখানে মানায় না।"

আর কথা না-বাড়িয়ে পারমিতা এবার রতন গাঙ্গুলীর ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসলো। রতন গাঙ্গুলী গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে জানলার কাঁচগুলো নামিয়ে দিলো। গাড়ী চলতে আরম্ভ করতেই পারমিতা বললো, "থামুন একটু।" রতন একটু অবাক হয়ে গেলো। পারমিতা মুখার্জির মাথায় আবার কী খেয়াল চাপছে কে জানে।

পারমিতা নিজেই এবার বললো, "চলুন।" পারমিতার ইচ্ছে হচ্ছিল দেবপ্রিয়র সামনে দিয়েই সে রতন গাঙ্গুলীর গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে যায়। দেবপ্রিয় এক বছরের জন্যে বিদেশে গিয়েছিল, আর রতন গাঙ্গুলী বিদেশে অনেকদিন কাটিয়েছে। রতন গাঙ্গুলী ইচ্ছে করলে এখনই আবার বিদেশে ফিরে যেতে পারে। বহু বছর দেশছাড়া, দেশের টানেই বহু টাকা ক্ষতি স্বীকার করেও রতন গাঙ্গুলী আবার দেশে ফিরে এসেছে। পারমিতার ইচ্ছে, দেবপ্রিয় রায় দেখুক, তাকে ছাড়াও পারমিতা মুখার্জির দিন মন্দ কাটছে না।

রতন গাঙ্গুলী এসবের কিছুই জানতে পারলো না, সে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরালো। গাড়ি বড় রাস্তায় পড়লো। পারমিতা বললো, "আপনাকে কেন গাড়ি থামাতে বললুম, জানতে চাইলেন না তো?"

গাড়ি চালানোয় মনোযোগ রেখে রতন উত্তর দিলো, "আপনি নিজে থেকে না বললে আমি অহেতুক কেন কৌতূহলী হবো?"

"আপনার আন্দাজটা কি শুনি।" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

রতন বললো, "ককটেল পার্টির শেষে রতন গাঙ্গুলীর মতো কোনো লোকের সঙ্গে একলা গাড়িতে ওঠা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা, ভাবছিলেন নিশ্চয়ই!"

"ওমা! আপনি আমার সম্বন্ধে এই সব খারাপ কথা ভেবে বসে আছেন।" পারমিতা বললো।

গাড়ি এতোক্ষণে নির্জন গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করেছে। "গাড়ি চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না আপনার?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

রতন বললো, 'ড্রিংকের পর আমি আরও স্টেডি হয়ে যাই—ড্রাইভিং-এ কোনোরকম অসুবিধে হয় না আমার।"

পারমিতার মাথায় নানা বদখেয়াল চাপছে। সে বললো, "ভাবছি এখনই আপনার ড্রাইভিং টেস্ট নেবো। গড়ের মাঠ, রেড রোড ঘুরে দেখান আপনার ড্রাইভিং ক্ষমতা।"

রতন গাঙ্গুলী অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে উল্লসিত হলো, গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলো।

প্রায় এক ঘন্টা ধরে পারমিতার নির্দেশ মতো নির্জন স্বল্পালোকিত নগরীর পথে পথে ড্রাইভ করেছে রতন গাঙ্গুলী। যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াবার নেশায় মত্ত হয়ে উঠেছে পারমিতা। কয়েকবার নিজেই রতন গাঙ্গুলীর ঠোঁটের সিগারেট জ্বালিয়ে দিয়েছে পারমিতা। সে কতদিন আগেকার কথা, সাহস করে দেবপ্রিয়র ঠোঁটে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে পারমিতা হাতের আঙুল পুড়িয়ে ফেলেছিল। দেবপ্রিয় অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে পুড়ে যাওয়া আঙুলটা ভালভাবে দেখেছিল। তারপর এই এতোদিনের মধ্যে পারমিতা কারও সিগারেটে আগুন ধরায়নি।

দেবপ্রিয়র সাইকেলের পিছনেও একবার চড়েছিল পারমিতা। নদীর ধার থেকে সাইকেলের পিছনে চড়ে পারমিতা পন্টন ব্রিজের কাছে চলে গিয়েছিল। ভয় ছিল কেউ হয়তো দেখে ফেলবে। তবু পারমিতা বলেছিল, "আমি যেখানে বলবো, সেখানে তোমাকে সাইকেলে চড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

দেবপ্রিয় বলেছিল, "এসব কি সাইকেলের কাজ! আগে চাকরি পাই, তখন তোমার জন্যে গাড়ি কিনবো।"

"শুধু আমার জন্যে গাড়ি কিনবে তুমি?" অবাক হয়ে গিয়েছিল

পারমিতা। বলেছিল, "আমার বাবা যদি বড়লোক হতেন, তা হলে বলতুম, বিয়েতে তোমাকে একটা নীল রংয়ের গাড়ি দিতে।"

"গাড়ি আমি নিজেই কিনবো। এবং সেই গাড়ি ড্রাইভ করে তুমি যেখানে হুকুম করবে সেখানে নিয়ে যাবো," বলেছিল দেবপ্রিয়।

পারমিতা যেন ঘুমের ঘোরে রয়েছে। হঠাৎ রতনকে জিজ্ঞেস করলো, "এই যে আমাকে নিয়ে রাত-দুপুরে এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আপনার ভাল লাগছে?"

এই ধরনের প্রশ্নের জন্যে রতন প্রস্তুত ছিল না। থার্ড গিয়ার থেকে টপ গিয়ারে তুলতে তুলতে রতন বললো, "আপনার ভাল লাগলেই আমার আনন্দ!"

লেডিজ হোস্টেলের সামনে এসে গাড়ি থামাতে পারমিতা বললো, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ককটেল পার্টির ওই সব বদ্ধ পরিবেশে কীরকম হাঁপিয়ে উঠেছিলাম--বাইরের খোলা হাওয়া পেয়ে দেহটা শান্ত হলো।"

রতন গাঙ্গুলী এই সময় এক কাণ্ড করে বসলো। নিজের দুটো হাত দিয়ে পারমিতার ডান হাত স্পর্শ করলো, "আজ আমি কৃতার্থ হলাম।"

হঠাৎ প্রচণ্ড এক হাসির ঢেউ এসে পারমিতাকে গ্রাস করবে মনে হলো। নিজের হাতটা রতনের হাত থেকে মুক্ত করে পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কখনও কোনো কমবয়সী সরল মেয়েকে ঠকিয়েছেন? তাকে বিয়ে করবেন না জেনেও, তার কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করেছেন? তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে একলা পেয়ে তার হাতখানা আপনার দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে খেলা করেছেন?"

রতন গাঙ্গুলী বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। ব্যাপারটা কী হলো সে ঠিক বুঝতে পারলো না। সে বলতে গেলো, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। না-বুঝে যদি আপনার বিরক্তি উৎপাদন করে থাকি, তা হলে ক্ষমা করবেন।" কিন্তু পারমিতা ততক্ষণে অনেকদূরে এগিয়ে গিয়েছে। লেডিজ হোস্টেলের গেটের মধ্যে তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখা গেলো।

পরের দিন শরীর শান্ত হয়েছে পারমিতার। গত রাত্রে হঠাৎ যেন প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সে।

অণিমাদি জিজ্ঞেস করলেন, "গতকাল কী হয়েছিল? মনে হলো সমস্ত রাত বকেছো। চিৎকার করে বলছো, খবরদার হাত ধোরো না আমার। ওসব কথা শুনলে বড় ভয় লাগে আমার। কোথাও বিপদে-আপদে পড়ে গিয়েছিলে নাকি? যা অদ্ভুত শহর এই কলকাতা।"

পারমিতা অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। ঘুমের ঘোরে কী বলেছে সে কে জানে? মিষ্টি হেসে পারমিতা বললো, "অদ্ভুত কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম হয়তো।"

"দেখো বাবা, বুঝে সুঝে স্বপ্ন দেখো। আমি প্রথমে ভাবলাম, কোনো লোক হয়তো আমাদের ঘরেই ঢুকে পড়েছে।"

অফিস যাবার পথে প্রতিভা কাপুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো পারমিতার। প্রতিভা কাপুরের চরিত্র সম্বন্ধে যতই বদনাম থাক, পারমিতাকে সে যথেষ্ট ভালবাসে এবং সম্মান করে। প্রতিভা এবার পারমিতাকে একটু কোণে নিয়ে গিয়ে বললো, "কাল রাত্রে আমার খুব আনন্দ হলো। এতোদিন ভয় ছিল, তুমি এবং অণিমাদি হয়তো সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে! তোমার পাশে একজন ইয়ংম্যানকে দেখে একটু ভরসা হলো।"

প্রতিভা কাপুর তার বয় ফ্রেন্ডকে নিয়ে রাত্রিবেলায় গড়ের মাঠে গিয়েছিল। সেখানেই রেসকোর্সের ধারে ওদের দুজনকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছে প্রতিভা। প্রতিভা চাপা উত্তেজনায় বললো, "কোয়াইট এ হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান। তোমার থেকেও লম্বা। চমৎকার ফিগার। তোমাদের মানাবে ভাল।" তারপর পারমিতাকে কোনো উত্তর দেবার

সুযোগ না দিয়েই জিজ্ঞেস করলো, "শেষ পর্যন্ত কী হলো? তোমার পিছন পিছন এসে লেডিজ হোস্টেলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম ইয়ংম্যান তোমার কাছে ক্ষমা চাইছে।"

পারমিতা বললো, "যা-সব ভাবছো কিছুই নয়। উই আর জাস্ট ফ্রেন্ডস।"

প্রতিভা কাপুর চোখে-মুখে এমন ভাব করলো যে বোঝা গেলো সে পারমিতাকে বিশ্বাস করছে না। সে বললো, "আমার মতো একটু কারাটে প্র্যাকটিস করে নিও। আত্মরক্ষার জাপানী পদ্ধতি। খালি হাতে দুটো ছেলের মহড়া নিতে পারবে। মাধবী তোমায় ছুরি দিয়েছে জানি—কিন্তু শী ইজ এ ফুল। প্রেম করতে বেরিয়ে কেউ রক্তারক্তি চায় না। কিন্তু বেশি লোভ দেখালেই কারাটের এক প্যাঁচেই তুমি যাকে ইচ্ছে ধরাশায়ী করতে পারো।"

অফিসে এসে আজ বেশ সঙ্কোচ বোধ করছে পারমিতা। দেবপ্রিয়কে দেখার পর কী যে খেয়াল চাপলো মাথায়, সে নিজেকে ছোট করে ফেললো। অফিসে যদি রটে থাকে পারমিতা মাতাল হয়ে লোক হাসিয়েছে, তা হলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না। ভাগ্যে সুদর্শন চৌধুরী আগেই পার্টি থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

পারমিতা ঘড়ির দিকে তাকালো। হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার কারখানা এক ঘন্টা আগে খুলে গিয়েছে। পারমিতা এখনও আশা করেছিল কারখানা থেকে দেবপ্রিয়র একটা ফোন আসবে। না, দেবপ্রিয় কোন দুঃখে ফোন করবে তাকে? সেসব তো কতদিন আগেকার কথা। তারপর তো বউ-এর সঙ্গে অনেকগুলো বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে দেবপ্রিয়।

সুদর্শন চৌধুরী ঝড়ের বেগে অফিসে ঢুকলেন। পারমিতাকে ডেকে বললেন, "ব্রিটিশ কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ টোনি মায়ারকে নিয়ে আমি বেরোচ্ছি। ওর সঙ্গে বাড়িতে বসেই আলাপ আলোচনা করবো। আমার সন্দেহ হচ্ছে অফিসের ভিতরের খবরাখবর পোদ্দারের কাছে চলে যাচ্ছে। এখানকার খবরাখবর নেবার জন্যে পোদ্দার মোটা টাকা খরচখরচা

করছে।"

সুদর্শনের কাছে টোনি মায়ারের আসার কারণও জানতে পারলো পারমিতা। হ্যারিংটন ইন্ডিয়া যাতে লাভজনক নতুন জিনিস তৈরি করতে পারে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন সুদর্শন চৌধুরী। নতুন ডিজেল এবং ইলেকট্রিক মোটর পাম্প তৈরির জন্যে কারিগরী সহযোগিতার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এই ধরনের পাম্পের বিপুল চাহিদা। তাছাড়া গ্রামে গ্রামে জলসেচের ব্যবস্থার জন্যেও এই জাতীয় বহু পাম্পের প্রয়োজন।

সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "টোনি মায়ার বিলেত থেকে যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সেটা কাজে লাগাতে পারলে হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে আমার স্বপ্ন সফল হবে।"

পারমিতা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সুদর্শন বললেন; "জগদ্বিখ্যাত ব্রিটিশ কোম্পানি শুধু আমাদের কারিগরী সহযোগিতা দেবে তাই নয়—আমাদের কারখানার অর্ধেক উৎপাদনও ওরা কিনে নিতে রাজী। ওদের ধারণা, ব্রিটিশ নো-হাউতে ওদের থেকে সস্তায় আমরা সমান সমান জিনিস তৈরি করতে পারবো—এবং সেই মোটর ও পাম্প ইউরোপের বাজারে বিক্রি করা ওদের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।"

একটু থামলেন সুদর্শন চৌধুরী। তারপর বললেন, "ব্যাপারটা আমি এখনও সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চাই। কারণ এই সুসংবাদটি পেলে পোদ্দার এবং তাঁর বন্ধুরা ফাটকা বাজারে হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার শেয়ারের দাম চড়িয়ে, আবার কোম্পানিকে নিজের ঝোলায় পোরবার চেষ্টা করবে। ওরা তো কলকারখানা তৈরি করতে কলকাতায় আসেনি—এসেছে বর্গীদের মতো রাতারাতি লুটপাট করে বড়লোক হতে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুদর্শন বললেন, "এখনও পর্যন্ত পোদ্দারের ধারণা হ্যারিংটন ইন্ডিয়া চিরকালের মত রুগ্ন হয়ে পড়েছে—এই কোম্পানিকে আবার চাঙ্গা করে তোলবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই সে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে দিল্লীতে গভরমেন্টকে আমি কিছু প্রস্তাব দিয়েছি, এই কোম্পানির রোগ সারিয়ে আবার তাকে পোদ্দারের

হাতে তুলে দেওয়ার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। একটু চাপ দিয়ে, সামান্য কিছু টাকা খরচ করে, প্রায় জলের দরেই গভরমেন্ট এই কোম্পানিতে পোদ্দারের শেয়ার কিনে নিতে পারেন। বেশি টাকা দাবী করার মতো মুখ এখন পোদ্দারের নেই—কারণ সে জানে কোম্পানির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি চাই, পোদ্দারের সঙ্গে দরদস্তুর পাকা হয়ে যাবার পরে কারখানা বাড়াবার নতুন প্রস্তাব সম্বন্ধে লোক জানুক।"

"আর পোদ্দারের প্রতিদ্বন্দ্বী মিস্টার খাণ্ডেলওয়ালা? তাঁরও তো এই কোম্পানির ওপর লোভ ছিল?"

সুদর্শনের কাছে পারমিতা শুনলো, খাণ্ডেলওয়ালা অধৈর্য হয়ে মেয়ে জামাইকে অন্য একটা কোম্পানি কিনে দিয়েছেন। বাজারে গুজব, শেয়ার মার্কেটে মোটা লোকসান করে খাণ্ডেলওয়ালা গোপনে পোদ্দারের সঙ্গে মিটমাট করেছেন এবং হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে তাঁর শেয়ার পোদ্দারের কাছে বিক্রি করেছেন।

কিন্তু এই সব গুজবে ভয় পান না সুদর্শন চৌধুরী।

সুদর্শন চৌধুরীর নিজস্ব কোম্পানি যেন এই হ্যারিংটন ইন্ডিয়া। সুদর্শন বললেন, "সমস্ত প্রোজেক্টের কথা ভেবে আমি উত্তেজিত বোধ করছি পারমিতা। আমরা প্রায় হাজার লোকের চাকরি দিতে পারবো। এই অফিসের বিমর্ষ ভাব কেটে যাবে। আমাদের দেশের জিনিস ইউরোপে বিক্রি হবে। দিল্লীর কর্তারাও যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাঁরা আমাকে বলেছেন, এগিয়ে যাও।"

সুদর্শন বললেন,"ব্রিটিশ প্রস্তাবটা গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা আমি মায়ারকে বলেছি। সব জায়গায় মায়ার বলবে, আমাদের কারখানায় বর্তমান মেসিনগুলোর কী অবস্থা তা দেখবার জন্যেই বিলেত থেকে তাকে আনানো হয়েছে। সম্ভব হলে, হ্যারিংটন ইন্ডিয়াকে কয়েকটা নতুন মেসিন বিক্রি করবার ইচ্ছেও তার আছে।"

সুদর্শন বেরিয়ে গেলেন। পারমিতা এবার অফিসের কাগজপত্রগুলো ঠিক করতে লাগলো। একটা অফিস চালানো যে কি জটিল কাজ তা

সুদর্শন চৌধুরীর একদিনের চিঠির ডাক দেখলেই বোঝা যায়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে রতন গাঙ্গুলীর কথা একবার মনে পড়লো। পারমিতা ভাবলো ফোন করে তাকে ধন্যবাদ দেবে। তারপর কী ভেবে পারমিতা ফোন করলো না। ফোন করা মানেই বোধহয় আরও কাছে এগিয়ে যাওয়া। কারও কাছে নিজে থেকে এগিয়ে যাবার ইচ্ছে পারমিতার আর নেই। সে-পূর্ব আট বছর আগেই তো শেষ হয়ে গিয়েছে। সরল মনে যথাসর্বস্ব নিয়ে সে তো দেবপ্রিয়র হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। কিন্তু দেবপ্রিয় তাকে....এবার একটা উপমা মনে পড়েছে পারমিতার—উৎসবের শেষে ভগ্ন মৃৎপাত্রের মতো—খেলার শেষে মাটির ভাঁড়ের মতোই দূরে সরিয়ে চলে গিয়েছিল।

ক্রিং-ক্রিং। টেলিফোন বাজছে পারমিতার। "হ্যালো, পারমিতা ?" ওদিকে রতন গাঙ্গুলীর গলা। কিন্তু রাতারাতি মিস মুখার্জি থেকে পারমিতা বনে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে না পারমিতার। গম্ভীর গলায় পারমিতা উত্তর দিলো, "বলুন।"

"আপনার কোনো অসুবিধে হয়নি তো ?" রতন গাঙ্গুলী জানতে চাইছে।

"অসুবিধে কী ?"

"আজ দুপুরে কোথায় লাঞ্চ করছেন ? আমার জন্মদিন আজ। যদি আপত্তি না থাকে কোথাও দুমুঠো খেয়ে আসা যাবে।"

বেশ মুশকিলে পড়ে যাচ্ছে পারমিতা। জন্মদিনে কেউ নেমন্তন্ন করলে, কী করে না বলা যায় ? কিন্তু পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে পারমিতাকেই লাঞ্চে নিমন্ত্রণ কেন ? পারমিতার দ্বিধার কথা রতন গাঙ্গুলী বোধহয় আন্দাজ করলো। বললো, "এখনই উত্তর দিতে হবে না। কাগজপত্র দেখে পরে ফোন করে দেবেন। আমি অফিসেই আছি।"

কিছুক্ষণ ধরে ছটফট করছে পারমিতা। রতন গাঙ্গুলীকে কিছু একটা বলে দেওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু কী বলবে সে ? পারমিতার দ্বিধার শেষ হলো একটা টেলিফোনে।

সুদর্শন চৌধুরী টেলিফোনে বললেন, "পারমিতা, সেদিন ককটেল পার্টিতে তোমাকে যা বলেছিলাম, দিল্লী থেকে এখনই আবার ট্রাঙ্ককলে রিমাইন্ডার এলো। ফ্যাকটরিতে করাপসন কেস রয়েছে একটা। অফিসে আর কাউকে জানাতে চাই না—তুমিই গোপনে অনুসন্ধান করে এসো। মেয়েরা এসব কাজে ভাল হবে বলে আমার মনে হয়।"

পারমিতা জানালো, মিস্টার চৌধুরীর ড্রয়ার থেকে ফাইলটা বার করে এখনই দেখছে সে।

সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "ইচ্ছে করলে আজই তুমি ফ্যাকটরিতে খবর দিয়ে চলে যেতে পারো। কেন যাচ্ছো, তা বলবার দরকার নেই। ব্যাপারটা গোপন রাখবার জন্যে তুমি টোনি মায়ারের ভিজিটের সুযোগ নিতে পারো। মিস্টার মায়ারের জন্যেই অ্যাজ ইফ তোমাকে যেন আমি কারখানায় পাঠাচ্ছি। ওয়ার্কস ম্যানেজারকে ফোন করে আমি বলে দিচ্ছি তোমার সঙ্গে যেন সব রকম সহযোগিতা করে। তুমি যা জানতে চাইবে তারই যেন উত্তর দেওয়া হয়—আমার কাজের জন্যেই তুমি ফ্যাকটরিতে যাচ্ছো।"

ফোন নামিয়ে ফাইলটা বার করলো পারমিতা। তারপর রতন গাঙ্গুলীকে জানালো, তার পক্ষে লাঞ্চে যাওয়া সম্ভব হবে না, অফিসের কাজে সে জড়িয়ে পড়েছে। তবে বুদ্ধি করে নিউ মার্কেটের ফ্লোরিস্ট মিস্টার বোসকে ফোন করলো পারমিতা। বললো, "রতন গাঙ্গুলীর বাড়ীতে একটা জন্মদিনের ফুলের স্তবক পাঠিয়ে দেবেন।" তলায় কি লেখা হবে জানতে চাইলেন মিস্টার বোস। পারমিতা বললো, "কোনো নাম দেবেন না। শুধু লিখে দেবেন—জনৈক বন্ধু।" ফুল পাঠিয়ে দেবার এই পদ্ধতিটা কলকাতায় বেশ চালু। মিস্টার চৌধুরীর নির্দেশমতো পারমিতাকে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় ফুল পাঠাতে হয়—কখনও এয়ারপোর্টে, কখনও বিয়েতে, কখনও জন্মদিনে, কখনও আবার মৃতদেহে। সব উপলক্ষেই বিশেষ ফুল আছে—নিউ মার্কেটে ফুলের বিশেষজ্ঞদের শুধু বলে দিলেই হলো।

কারখানায় যাবার পথে পারমিতা একবার অপুর বাড়িতে থামলো। ওর কাপড় চোপড়ের প্যাকেটটা সঙ্গে করে এনেছিল। প্যাকেটটা নিয়ে অপু বললো, "কাপড়টা ফেরত দেবার জন্যে তোর ঘুম হচ্ছিল না বুঝি।"

অপু বললো, "তুই আমার বরের মাথাও ঘুরিয়ে দিয়ে গেছিস। তুই চলে যাবার পরে হাজার রকম খবর দিতে হলো। তোর অফিসটার নাম কী রে?"

"হ্যারিংটন ইন্ডিয়া।"

অপু আশ্বস্ত হলো। "তা হলে কর্তাকে ঠিকই বলেছি। কর্তা বলেছে তোমার বান্ধবীকে মাঝে মাঝে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসবে। আর এবার থেকে আমি আর অন্য কাজে জড়িয়ে পড়বো না—খবর পেলেই তোমাদের আড্ডায় জয়েন করবো। আমার তো শুনে ভাই রীতিমতো দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। আমার আরও অনেক বান্ধবী আসে, কিন্তু কারও জন্যে কর্তা বাড়িতে ফিরে এসে আড্ডায় যোগ দেবার প্রস্তাব করেনি।"

পারমিতাও কম মুখরা নয়। বললো, "মনোপলি আইনের কথা শুনেছো? কাউকে আর একতরফা একচেটিয়া ভোগদখল করা যাবে না।"

অপু বললো, "দূর পোড়ারমুখী। রতন গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হলো সেদিন? ছোকরার মতিগতি কীরকম মনে হলো?"

"কাজ নিয়ে আমি এখন খুব ব্যস্ত অপু। চেয়ারম্যান এখনই আমাকে ফ্যাকটরিতে পাঠাচ্ছেন।"

ফোঁস করে উঠল অপু। "সদু চিনেছেন কদু। দিনরাত শুধু চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান, আর চেয়ারম্যান। বুড়োর কি ভীমরতি ধরেছে? অফিসে কি তুই ছাড়া আর কোনো অফিসার নেই? প্রেমে ঘেন্না ধরিয়ে তুই যদি-না পুরুষমানুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে চাকরি করতে আসতিস তা হলে বুড়োর কী হতো?"

"বুড়ো বুড়ো করিস না, অপু। মিস্টার চৌধুরীর এখন তিপ্পান্ন কমপ্লিট হয়নি।"

"ওরে বাপরে ! তিপ্পান্ন বছরের মিনসেকেও বুড়ো বলা চলবে না। তোর হলো কি, মিতা ? তোর যা মতিগতি দেখছি, শেষ পর্যন্ত বুড়ো হাবড়া কারুর গলায় না মালা দিয়ে বসিস। এর নাম গ্র্যান্ডফাদার ফিক্সেসন—ইংরিজি কচিকচি মেয়েদের বুড়োপিরীত নিয়ে রসালো সব নাটক নবেল বেরুচ্ছে।"

"ওসব রসিকতা ছাড়। অদ্ভুত মানুষ এই চৌধুরী সায়েব। আমাদের দেশে উঁচু লেভেলের অফিসাররা যদি ওইরকম নিষ্ঠাবান হতেন তা হলে দেশের অনেক দুঃখ ঘুচে যেতো।"

"সে তো বুঝলাম ? কিন্তু তোর কেন বুড়োর ওপর এতো টান ?" দুষ্টু হেসে ফোড়ন কাটল অপু।

পারমিতা এবার গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো, "বুড়োরাই আমার ভাল। সমবয়সীদের ওপর টান তো দেখিয়েছিলাম একবার। কী ফল পেয়েছিলাম সে তো জানতে তোর বাকি নেই।"

এবার বেশ জোরে বকুনি লাগালো অপু। "পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে তুই সত্যিই ভালবাসিস। কবে মফঃস্বলের কোন শহরে কার সঙ্গে তোর কী হয়েছিল তা তুই এখনো মনে রেখেছিস ?"

পারমিতা হাসলো। অনেকদিন পরে হঠাৎ অপুর দেওয়া কাপড় পরেই সে যে আবার পুরনো কাসুন্দির সাক্ষাৎ পেয়েছে এ-খবরটা সে আর বন্ধুকে দিলো না।

দুই বান্ধবী যখন নিজেদের সুখ-দুঃখের আলোচনায় ব্যস্ত তখন ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার ডেপুটি চেয়ারম্যান ভেঙ্কটরমণ গম্ভীরমুখে ডাইনিং টেবিলে বসে রয়েছেন। তাঁর প্লেটে ইডলি ঠাণ্ডা হতে দেখে গৃহিণী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার শরীর খারাপ হলো নাকি ?"

ভেঙ্কটরমণের শরীর বেশ ভালই আছে। "তাহলে কী ভাবছো ?" জানতে চাইলেন ভেঙ্কটরমণ গৃহিণী।

"ভাবছি আমাদের ভবিষ্যতের কথা—আমার সিকিউরিটির কথা। আজকাল মাঝে মাঝে বেশ চিন্তা হয়।"

মিসেস্ ভেঙ্কটরমণ স্বামীর পাতে ফলের স্যালাড দিতে দিতে বললেন, "অত ভেবে লাভ কী। স্টেনোগ্রাফার হিসেবে কলকাতায় এসে কোম্পানির ডিরেকটর হয়েছো, ফার্স্ট শিকাগো ব্যাংকে আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে এক লাখ টাকা রয়েছে, স্টেট ব্যাংকের ফিকস্‌ড ডিপোজিটে রয়েছে দেড় লাখ টাকা, ম্যাড্রাস টাউনের উপর দেড় লাখ টাকার বাড়ি করেছো, এখনও চাকরি রয়েছে, আমাদের মাত্র একটি মেয়ে, সুতরাং ভবিষ্যতের চিন্তা কী?"

মিস্টার ভেঙ্কটরমণ সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "সেই জন্যেই তো চিন্তা। ছেলে নেই যে তোমাকে বুড়ো বয়সে দেখবে, সুতরাং ওল্ড এজের জন্যে ব্যবস্থা রাখতে হবে।"

মিসেস্ ভেঙ্কটরমণ জানতে চাইলেন, "হলো কী?"

তারপর স্বামীর কাছে শুনলেন, সুদর্শন চৌধুরী পদস্থ অফিসারদের অনেক সুযোগ-সুবিধে কমিয়ে দিচ্ছেন। গায়ত্রী ভেঙ্কটরমণের গোবিন্দপুর লেডিজ গলফ্ ক্লাবের সমস্ত খরচ-খরচার বিল এতোদিন কোম্পানি দিয়েছে। এবার থেকে তা বন্ধ। খবরটা শুনে মিসেস্ ভেঙ্কটরমণও উদ্বিগ্ন হলেন, "এই দুর্মূল্যের বাজারে সবার রোজগার বাড়ছে অথচ তোমার কমছে।"

"মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব শুরু হয়েছে অফিসে। যা-খুশী করছেন সুদর্শন চৌধুরী।"

"উইথ দি হেল্প অফ দ্যাট সি আই এ লেডি?"

"সি আই এ নয়—সি বি আই। এরা সি আই এ থেকেও একশ গুণ পাজি, শুধু আমাদের পিছনে কাঠি দেবার চেষ্টা করে।"

মিসেস্ ভেঙ্কটরমণ নিজেও একটু অন্যমনস্ক হয়ে উঠলেন। এতোদিন ধরে গোবিন্দপুর মেয়ে গল্‌ফ ক্লাবে তিনি মনের সুখে খরচ করেছেন, যত খুশী ড্রিংক করেছেন, অন্যকে অফার করেছেন, এবং কোনো ভাবনা-

চিন্তা না করে ভাউচারে সই করেছেন। সেইসব বিল চলে গিয়েছে সোজা অফিসে। গল্‌ফ ক্লাবের খরচটা মিসেস্ ভেঙ্কটরমণই তদানীন্তন বড়সায়েবের বউ-এর কাছ থেকে বাগিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কাউকে বোলো না, এসব খরচ তুমি কেন দেবে? অফিস যাতে দায়িত্ব নেয় তার ব্যবস্থা আমি করে দেবো।"

মিসেস্ ভেঙ্কটরমণ বিরক্তভাবে বললেন, "এই যে আমি গল্‌ফ খেলি, তাতে কোম্পানির উপকার হয় না? কত ইম্পর্টান্ট অফিসারের বউয়ের সঙ্গে জানাশোনা হচ্ছে, তা থেকে তাদের স্বামীরা হ্যারিংটন ইন্ডিয়া সম্বন্ধে জানছে—কোনো কাজকর্ম আটকালে তোমরা কত সহজে এসব করে আনতে পারবে।"

"এসব আমাকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই গায়ত্রী। আমাদের সঙ্গে কোনোরকম পরামর্শ না করেই সুদর্শন চৌধুরী অর্ডার দিয়েছেন। এইসব নাকি বাজে খরচ!"

"ঠিক আছে, তোমার বস-এর যদি তাই ইচ্ছে হয়, আমি গল্‌ফ ক্লাবের মেম্বারশিপ ছেড়ে দেবো। তুমি তো কখনও এম-ডির অবাধ্য হওনি। সারা জীবন প্রত্যেকের কথা শুনে এসেছো।"

"এম-ডি!" দাঁতে দাঁত চেপে ব্যঙ্গ করলেন ভেঙ্কটরমণ। "সুদর্শন চৌধুরী মোটেই ম্যানেজিং ডিরেকটর নয়—জাস্ট এ চেয়ারম্যান অফ দি বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপয়েনটেড বাই গভরমেন্ট। এই কোম্পানির মালিক এখনও মিস্টার পোদ্দার, যে-কোনো সময়ে তিনি আবার কোম্পানিতে ফিরে আসতে পারেন।"

গায়ত্রী দেবী মনে করিয়ে দিলেন, "আমরা নির্বিবাদী মানুষ। তুমিই তো বলেছিলে, কোম্পানিতে যিনিই ক্ষমতায় থাকবেন আমরা তাঁর সেবা করবো এবং হুকুম তামিল করবো। গত তিরিশ বছরে কতবার কোম্পানিতে ক্ষমতা বদল হয়েছে। নতুন নতুন এম-ডি এসেছেন, কিন্তু তোমার কোনো অসুবিধা হয়নি—তুমি সবাইকে সার্ভিস দিয়ে সন্তুষ্ট করে ধাপে ধাপে উন্নতি করেছো।"

"উন্নতি আর করলাম কই? একটা অর্ডিনারি ডিরেকটর হয়েই রয়ে গেলাম। এখন ডিরেকটর বোর্ড নেই বলে, ভদ্রতা করে ডেপুটি চেয়ারম্যান বলে। কিন্তু আমার অবস্থা বেয়ারাদের থেকেও খারাপ। নিজের স্ত্রীর গলফ ক্লাবের সামান্য সাত-আট'শ টাকা মাসিক খরচ স্যাংশন করার মত ক্ষমতাও আমার নেই।"

"পোদ্দাররা ক্ষমতায় এলে বোধ হয় তোমার এই অসুবিধে হতো না।"

এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না মিস্টার ভেঙ্কটরমণ। বললেন, "ভোগীলাল পোদ্দার—এদের আউটলুক মুদিখানার দোকানদারের মতো।"

গায়ত্রী দেবী একমত হলেন না। স্বামীকে আশ্বস্ত করে বললেন, "সেসব ওয়ান্‌স আপন এ টাইম, ডার্লিং। এখন ভোগীলালজীর ভাইঝি আমাদের গোবিন্দপুর লেডিজ গলফ ক্লাবে খেলছে। ভোগীলালজীর স্ত্রী অমন মোটা, কিন্তু ভাইঝির ফিগার ফিল্মস্টারের মতো। কেনই বা হবে না--মেয়েটা রোজ এক টিন ইটালিয়ান অলিভ অয়েলে স্নান করে।" একটু থেমে গায়ত্রী দেবী আরও বললেন, "ভোগীলাল পোদ্দার কনসার্নের দু-তিনজন অফিসারের বউ রেগুলার আমাদের ক্লাবে যাতায়াত করে।"

"তাদের খরচ অফিস থেকে দিচ্ছে?" একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন ভেঙ্কটরমণ।

"অবশ্যই দিচ্ছে। তবে বিল সই করে অফিসে যাচ্ছে না। কাঁচা টাকায় খরচ দিচ্ছে। যারা অফিসের ফেভারিট তারা ভাউচার সই না করেই খামে টাকা পায়।"

"ব্ল্যাক মানি?" একটু অস্বস্তি বোধ করলেন ভেঙ্কটরমণ।

"রাখো তোমার ব্ল্যাক আর হোয়াইট মানি! টাকা কখনও সাদা হয়? সাদা কাগজের কোনো দাম নেই, যতক্ষণ না তার ওপর কালোকালি দিয়ে অশোকস্তম্ভের ছাপ মারা হচ্ছে।"

"ভারি সুন্দর কথাটি বলেছো তো, ডার্লিং।"

গায়ত্রীর হীরের নাকছাবিটা জ্বলজ্বল করে উঠলো। তিনি বললেন, "কথাটা আমার নয়, পোদ্দার কনসার্নের একটি মেয়ে আমাদের মেম্বার হয়েছে, তার নাম অপর্ণা বসু।"

ভেঙ্কটরমণ মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, কোম্পানিতে নাম্বার ওয়ান না হলে সুখ নেই। যত ক্ষমতা যেন সুইচের। আজ যদি তিনি ম্যানেজিং ডিরেকটর অথবা চেয়ারম্যান হতেন তা হলে তাঁর স্ত্রীর গল্‌ফ ক্লাবের বিল নাকচ করে দেবার সাধ্য কারুর হতো না।

ভেঙ্কটরমণের মনে পড়লো, কিছুদিন আগে এক পার্টিতে পোদ্দারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। পোদ্দার কায়দা করে বলেছিল, "এই কোম্পানিতে যদি কারুর চেয়ারম্যান হওয়া উচিত ছিল সে আপনি, মিঃ ভেঙ্কটরমণ। সরকারের লোকেরা সুযোগ পেলে উড়ে এসে জুড়ে বসে। আরে বাবা, তোমরা যদি এতোই কাজের লোক এবং এতোই সৎ তা হলে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলো ভালভাবে চালাও না কেন?"

নিজের কর্মজীবনের চলচ্চিত্রটা ভেঙ্কটরমণ মুহূর্তে দেখে ফেললেন। দুর্জনেরা বলে এসেছে নির্লজ্জ অয়েলিং করে ভেঙ্কটরমণ কোম্পানির উঁচু পোস্টে বসেছেন। ভেঙ্কটরমণের বিশ্বাস, নিজের প্রতিভায় এবং কাজের জোরে তিনি বড় হয়েছেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি দেখেছেন, বড় কর্তাদের সঙ্গে যেন খটাখটি না লাগে। পদস্থদের তিনি সব সময় আনুগত্য দিয়েছেন। তার ফলে কোম্পানিকে বাঁচাবার জন্যে যখন চেয়ারম্যান এলেন, ডিরেকটর বোর্ড থেকে পোদ্দারের লোকজনকে বিদায় করলেন, তখনও ভেঙ্কটরমণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছিল। পুরনো ডিরেকটরদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্টে টিকে গিয়েছিলেন। তার কারণ, সুদর্শন চৌধুরীকে তিনি নিজের কাজে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সুদর্শন বিশ্বাস করেছিলেন, ভেঙ্কটরমণ অফিসে থাকলে কোম্পানির আর্থিক রোগ দ্রুত সারবে। হাতে হাতে ফল দেখিয়েছেন ভেঙ্কটরমণ। পোদ্দার-আমলে যাই করে থাকুন তিনি, চৌধুরীযুগে তিনি

পুরনো কয়েকটা কেলেংকারী ফাঁস করে দিয়েছেন—তাঁর রিপোর্টে বেশ কয়েকজনের চাকরি গিয়েছে এই অফিস থেকে। ভেঙ্কটরমণ চেয়েছিলেন তিনি চেয়ারম্যানের দক্ষিণহস্ত হবেন। হয়েছিলেনও তাই। কিন্তু তারপর কী যে হলো। সুদর্শন চৌধুরী কোথা থেকে একরত্তি মেয়েকে জোগাড় করে আনলেন—এবং বেশ বোঝা যাচ্ছে চৌধুরী অনেক ব্যাপারে এখন তাঁর ওপর তেমন নির্ভর করছেন না।

স্বামীর মনোকষ্টের কথা গৃহিণী জানেন। গায়ত্রী বলে, "হয়তো মিস্টার চৌধুরীর কোনো দোষ নেই। দিল্লীর লোকগুলো আজকাল যা হয়েছে—গুপ্তচর দিয়েই তারা দেশ চালাতে চায়। ও মেয়ের হাবভাব দেখলেই মনে হয় স্পাইং করবার জন্যেই এখানে এসেছে।"

মনে মনে হাসলেন ভেঙ্কটরমণ। স্পাই-এর ওপর কীভাবে স্পাইং করতে হয়, তা তাঁরও অজানা নেই।

ভেঙ্কটরমণ যখন আত্মচিন্তায় নিমগ্ন, তখন পারমিতা ফ্যাকটরির পথে। হাতের ফাইলটা সে আর একবার মন দিয়ে পড়ছে। হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার কয়েকটি দামী মেশিন পোদ্দার এক সময় জলের দরে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিছু মেশিন বিক্রিও হয়েছিল—রাতারাতি সরকার দায়িত্ব না নিলে আরও অনেক কিছু বিক্রি হয়ে যেতো। সুদর্শন চৌধুরীর ধারণা, কোম্পানির কিছু লোক এই ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে সাহায্য না করলে পোদ্দার এতোখানি এগোতে পারতো না। দিল্লি থেকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বার করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সেই সব লোককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

ফাইলের শুরু হয়েছে একটা উড়ো চিঠি থেকে। উড়ো চিঠি থেকেই এই ধরনের ফাইলের উৎপত্তি হয়ে থাকে। কেউ হিংসেয়, কেউ রাগে, কেউ বা স্রেফ কাদা ছেটাবার উৎসাহে সহকর্মী এবং পদস্থের বিরুদ্ধে গোপন পত্রের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। এক্ষেত্রে হাতের লেখা কোনো মহিলার। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই পুরুষসর্বস্ব জঙ্গলে মেয়েরা আবার কেন অবতীর্ণ হলো? পরে পারমিতার মনে হলো, মহিলার হস্তলিপির পিছনে

নিশ্চয় কোনো অদৃশ্য পুরুষহস্ত রয়েছে। এসব কাজে মেয়েদের লেলিয়ে দেওয়াই নিরাপদ।

নিজের মনেই হাসলো পারমিতা। পত্রলেখিকা নিশ্চয় ভাবতেও পারেনি একজন মহিলার হাতেই আবার অনুসন্ধানের দায়িত্ব পড়বে।

এই অনাচারের মূলোচ্ছেদ করবে পারমিতা। নিজেদের স্বার্থে যারা প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত নয়, হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে তাদের কোনো স্থান থাকবে না। শুধু স্থান নয়, সুদর্শন চৌধুরী বলেছেন, "তাদের আমরা জেলে পাঠাবো। মোটামুটি অনুসন্ধানের পরে আমরা সি বি আইয়ের হাতে কেস তুলে দেবো।"

ফাইলটা মুড়ে অফিস ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলো পারমিতা। নিজের চশমার কাঁচ শাড়ির আঁচলে মুছলো। তারপর ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। মাত্র কয়েক বছর আগেও যে মফস্বলের ভীরু মেয়েটি ছিল, একলা রাস্তায় বেরোবার সাহস ছিল না যার, যাকে পাত্রস্থ করবার জন্যে বাবা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সে আজ কেমন পাল্টে গিয়েছে—সে এখন কারখানায় গোপন অনুসন্ধানে চলেছে। তার কলমের খোঁচায় কেউ উঠবে, কেউ-বা তলিয়ে যাবে।

এই জীবনে প্রবেশ করবার কথা পারমিতা কল্পনাও করতে পারতো না। যখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে সে দেবপ্রিয়র অপেক্ষায় বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো, তখন লেখাপড়া, কলেজ, কেরিয়ার এসব কিছুই মাথায় ঢুকতো না—একমাত্র দেবপ্রিয়র মুখটা ছাড়া। দেবপ্রিয়র একটা ছবি ওদের ইনজিনীয়ারিং কলেজ-ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। সে তখন কলেজের সোস্যাল সেক্রেটারি। সেই ছবিটার দিকে পারমিতা কতদিন যে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থেকেছে তার ঠিক নেই। ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে অদ্ভুত সব আইডিয়া মাথায় আসতো। দেওয়ালে তখন দিদি ও জামাইবাবুর বিয়ের পরে তোলা ছবিটা টাঙানো ছিল। হঠাৎ দেবপ্রিয়র ছবিটা ম্যাগাজিনের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে আকারে বাড়তে আরম্ভ করতো, পারমিতা বেশ বুঝতে পারতো ছবিটা রঙীন

হয়ে উঠেছে, আর তার ঠিক পাশেই নিজের একটা রঙীন ছবি দেখতে পেতো পারমিতা। দেবপ্রিয় পরেছে গরদের পাঞ্জাবী, গলায় সোনার বোতাম, মাথায় ঢেউ খেলানো ঘন কালো চুল, আর পারমিতা পরেছে লাল বেনারসী--যার ওপরে অসংখ্য সোনালী ফুল। রঙীন ছবিতে পারমিতার সিঁথিতে লাল সিঁদুরের দাগ স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে। যুগলমিলনের এই ছবিটা দিদি-জামাইবাবুর ছবির ঠিক পাশেই টাঙানো দেখতে পেতো পারমিতা। চোখ বুজে একটা চেষ্টা করলেই বোধ হয় স্মৃতির পটে এঁকে ফেলতে পারে। কিন্তু স্টেশন এসে গিয়েছে, ইলেকট্রিক এমু কোচ সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে পড়লো।

হ্যারিংটন টাউনশিপের মোড়ে ফ্যাকটরির গাড়িতে বসেই পারমিতা আর একটা গাড়ি আসতে দেখলো। হাতের ইঙ্গিতে তারা পারমিতার গাড়ি থামালো, তারপর মণিকা রায় গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। ড্রাইভারের আসনে স্বয়ং দেবপ্রিয় রায়। পারমিতা বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো।

"বেশ মেয়ে তো আপনি। লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে না জানিয়ে কারখানায় আসছেন," সরস অভিযোগ করলেন মণিকা রায়।

পারমিতা কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। কোনোরকমে উত্তর দিলো, "হেড অফিস থেকে যত লোক আসে সবাই যদি আপনাদের ডিসটার্ব করে।"

"যত লোকই হেড অফিস থেকে আসুক! আমাদের কাছে ভি-আই-পি বলতে আপনি একাই।"

মণিকা রায়ের এই কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পারছে না পারমিতা। হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার একমাত্র মহিলা-অফিসার বলতে পারমিতা, এই কথাই বোঝাচ্ছেন মণিকা, না পারমিতা মুখার্জির অতীত ইতিহাস তাঁর জানা হয়ে গেছে? দেবপ্রিয় এতোক্ষণে গাড়ির দরজা বন্ধ করে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দেবপ্রিয়র চোখে-মুখে কোনো উৎকণ্ঠা বা অস্বস্তির চিহ্ন নেই। মণিকা

বললো, "হেড অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে থাকা অফিসার আপনারা—ফ্যাক্টরিতে আপনার আবার কাজ কী?"

দেবপ্রিয় স্ত্রীকে বাধা দিলো। "কত রকমের কাজ থাকতে পারে, মণিকা।"

পারমিতা সহজ হবার চেষ্টা করলো।

"সেদিন পার্টিতে এক সায়েবকে দেখেছিলেন?"

"তিনি তো জামাই আদর খাচ্ছেন এখানে সকাল থেকে।" মণিকা জানালো।

"জামাইবাবুটিকে দেখাশোনা করবার জন্যে আমরাও ছুটে চলে এলাম।"

মণিকা বললে, "আজকেই ফিরে যাবেন নাকি?"

"ঠিক নেই," জানালো পারমিতা। "আগে ফ্যাকটরির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করি।"

"আমি একটু পরেই ম্যানেজার মিস্টার শর্মার কাছে জেনে নেবো," বললো মণিকা। "তারপর দেখা সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

ফ্যাকটরি ম্যানেজার মিস্টার রমেশ শর্মা কিছুক্ষণ পারমিতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। ফ্যাকটরির সেই দুর্দিনে রমেশ শর্মা ওয়ার্কস্টাডি ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তখনকার ম্যানেজার মিস্টার চোপরা রেজিগনেশন দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। মুখ গম্ভীর করে শর্মা বললেন, "ওই সময়ে কারখানায় নানা অব্যবস্থা চলছিল আমি জানি। তিন মাস আমি ফরেনে ছিলাম, ফিরে এসে নিজের কাজ নিয়ে পড়েছিলাম। তখন কারখানায় কী সব ঘটেছিল আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।"

"কোম্পানির ভবিষ্যতের কথা ভেবে অতীত ঘটনা কিছু কিছু খুঁড়ে বার করতে হবে আমাদের," পারমিতা বেশ গম্ভীরভাবেই জানিয়ে দিলো।

শর্মা বললেন, "ইউ আর ওয়েলকাম। যে-সব ফাইলপত্র আপনি দেখতে চান দেখুন। যে-সব অফিসারদের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে

চান করুন। চেয়ারম্যান আমাকে আপনার সম্বন্ধে বলেছেন।"

কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আছে কিনা জানবার আগ্রহ ছিল শর্মার। কিন্তু পারমিতা বিশেষ কিছু প্রকাশ করলো না। শর্মা মনে মনে ভাবলেন, সি-বি-আই সম্পর্কে এই মহিলাকে নিয়ে যে গুজব কানে এসেছিল তা মিথ্যে নয় তা হলে।

অনেকগুলো পুরনো ফাইল বার করে পারমিতা তার গবেষণা শুরু করলো ! সুদর্শন একবার বলেছিলেন, যে-কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে কাগজগুলো সময় অনুযায়ী সাজিয়ে নেবে। তারপর ফাইলের তলা থেকে পড়তে শুরু করবে।

কাগজপত্র সাজিয়ে নিয়ে পারমিতা কারখানার ইনটারনাল অডিটার মিস্টার অনন্তলিঙ্গম এবং পার্সোনেল ম্যানেজার সুরেশ বোসকে ডাকলো। এঁদের কাছ থেকে কোন অফিসারের কী দায়িত্ব সে সম্বন্ধে পারমিতা কিছুটা ওয়াকিবহাল হলো।

ফাইলের এই গন্ধমাদন পর্বত থেকে আসল খবরটুকু বার করতে যথেষ্ট সময় এবং ধৈর্য লাগবে। সময় ও ধৈর্যের কোনোটারই অভাব নেই পারমিতার। সুতরাং প্রয়োজন হলে সে কয়েকদিন এখানে থেকে যাবে। মিস্টার শর্মা বললেন, "কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের চমৎকার রেস্ট হাউস রয়েছে। সেখানে অসুবিধে হলে যে-কোনো ফ্যামিলি-বাংলোতেও আপনার ব্যবস্থা হতে পারে।"

ফোনে কলকাতায় খবরটা জানিয়ে দিলো পারমিতা। অণিমাদি বললেন, "ওই সায়েবটাও সঙ্গে আছে নাকি। সাবধানে থেকো।"

আবার কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছে পারমিতা। একখানা মেশিন বিক্রির ফাইল খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লো পারমিতা। বিক্রির অর্ডারে সই করেছেন চোপরা সায়েব। এই চোপরা ছিলেন পোদ্দারের ল্যাপডগ। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে পোদ্দারের নৈনি কারখানায় চাকরি নিয়েছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছিলেন, এখানে থাকলে জেলে যাবার সম্ভাবনা।

ফাইলটাতে আরও একজনের হাতের লেখা রয়েছে। এই হাতের লেখাটা কার? পারমিতার সমস্ত শরীরটা হঠাৎ শিরশির করে উঠলো। এই হাতের লেখা কার তা জেনে নেবার জন্যে পারমিতাকে কারুর কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। এ হাতের লেখা অনেক চিঠি একদিন পারমিতা ব্লাউজের ফাঁকে বুকের মধ্যিখানে লুকিয়ে রেখেছে। দেবপ্রিয় বাংলার বাইরে মানুষ—বাংলা চিঠির মধ্যে প্রায়ই ইংরিজি লিখে ফেলতো।

টেলিফোন বাজছে। "হ্যালো, হ্যালো, মিস মুখার্জি। আমি মিসেস রায় কথা বলছি। শর্মার কাছে শুনলাম, আপনি আজ এখানেই থেকে যাচ্ছেন। আজ আমাদের এখানে খাবেন, আমার এবং আমার কর্তার খুব ইচ্ছে।"

"ইচ্ছেটা কার? আপনার না মিস্টার রায়ের?"

"আমাদের দুজনেরই। বিয়ের মন্তর পড়ে কর্তা-গিন্নী তো এক হয়ে গেছি" রসিকতা করলেন মণিকা।

মণিকা এখনও জানে না তার স্বামীর ভাগ্যাকাশে কী মেঘ জমা হয়ে উঠেছে। মেশিন বেচে ফেলবার ষড়যন্ত্রে দেবপ্রিয়র যে অংশ ছিল এমন একটা সন্দেহের ইঙ্গিত কাগজপত্রের মধ্যে উঁকি মারছে।

দেবপ্রিয় রায়কে ডেকে পাঠানো যাক। তার ঘরে বসে এসব আলোচনা না করাই ভাল। মিস্টার শর্মাকে একটা স্লিপ পাঠালো পারমিতা—মে আই সী মিস্টার ডি পি রায়? ফোনে শর্মা জানালেন তিনি এখনই ডি পি রায়ের খোঁজ করছেন।

মিটিং রুমটাই সাময়িকভাবে পারমিতার অফিস হয়েছে। সেখানে বসে পারমিতার মনে পড়ছে, আট বছর আগে এমনই একটি বিকেলে খামে মুড়ে জরুরী চিঠি পাঠিয়েছিল পারমিতা। দেবপ্রিয়কে মিনতি করেছিল একবার সে দেখা করতে চায়। কোথায় কীভাবে দেখা হতে পারে চিঠিতে জানাতে বলেছিল পারমিতা। কিন্তু দেবপ্রিয় কোনো উত্তর দেয়নি।

অনেক অপেক্ষা করেছে পারমিতা, কিন্তু কোনো উত্তর আসেনি।

পারমিতা সমস্ত রাত জেগে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছিল। একটা বিশ্বাস ছিল, দেবপ্রিয় কখনও নিশ্চয় এতো নিচেয় নামবে না, ঠিক দেখা করবে। কিন্তু কোথায় দেবপ্রিয়?

আট বছর পরে আজও আবার স্লিপ পাঠাতে হলো ; এবং কী আশ্চর্য, দেবপ্রিয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর কাছে হাজির হয়েছে। দরজায় নক্ করে দেবপ্রিয় জিজ্ঞেস করছে, "আসতে পারি?"

কী উত্তর দেবে পারমিতা? 'আসুন'? অথবা 'এসো'? তুমি এবং আপনি এই সমস্যা ইংরিজীতে নেই—সেখানে সবাই 'ইউ'। পারমিতা একটু দেরি করেই বললো, "কাম ইন।"

একান্তে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুজনের দেখা হলো। দুজনে দুজনের দিকে একটু অস্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে আছে। কোনো এক মধুরাত্রিতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দুজনের দেখা হবে এমন একটা স্বপ্ন পারমিতার অবশ্যই ছিল—তখন পারমিতার গলায় থাকবে ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। দেবপ্রিয়র গলাতেও মালা, মুখে হাসি, দেহে চন্দনের সুগন্ধ। সেই দেখা হলো, দরজা রুদ্ধ। কিন্তু পারমিতার হাতে এখন কলম, সামনে ফাইল ; আর দেবপ্রিয়র সাদা শার্টে ঘামের ছোপ ও খাকি প্যান্টে কারখানার কালিঝুলি।

দেবপ্রিয় এখনও বোঝেনি, পারমিতা কেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। সে ভেবেছে, মণিকার সঙ্গে বাড়িতে দেখা হবার আগে পারমিতা একান্তে তার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলে নিতে চায়।

দেবপ্রিয়কে বসতেও বলেনি পারমিতা। সে নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়েছে! পকেট থেকে টার্কিশ রুমাল বার করে ঘাড়ের ঘাম মুছলো দেবপ্রিয়। কে প্রথম এই বিজন ঘরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করবে? দেবপ্রিয় এবার বললো, "সেদিনকার ইনসিডেন্টের জন্যে আমি দুঃখিত পারমিতা।"

কোনদিনকার ঘটনার কথা বলছে দেবপ্রিয়? আট বছর আগে যেদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে চিঠি লিখে পারমিতা একবার সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিল? যদি সত্যিই দুঃখ হয়ে থাকে, তার জন্যে আট

বছর পারমিতাকে অপেক্ষা করতে হলো কেন? কোনো এক সময়ে তাকে একখানি চিঠি পাঠালেই তো হতো, পারমিতাকে এতোদিন তা হলে আগুনে পুড়তে হতো না।

না, ভুল করছে পারমিতা। আট বছর আগে যে-সব ঘটনা ঘটেছে দেবপ্রিয় তার উল্লেখ করছে না। সে-সব কথা তার মনে আছে কিনা সন্দেহ। স্বার্থপর পুরুষমানুষরা পুরনো প্রেমকে এঁটো খুরির মতোই অবহেলা করে। দেবপ্রিয় সেদিনকার পার্টির কথা বলছে।

দেবপ্রিয় বললো, "তোমাকে যে ভালভাবে চিনি, সেদিন তা ওখানে প্রকাশ করিনি।"

পারমিতা মনে মনে বললো, "চিনি নয়, চিনতাম। এই পারমিতাকে তুমি চেনো না দেবপ্রিয় রায়।"

দেবপ্রিয় বললো, "একটা সিগারেট ধরাতে পারি?"

অনুমতি দিলো পারমিতা। কিন্তু এক বছর বিলেতে থেকেও দেবপ্রিয় এখনও ম্যানারস্ শেখেনি—যার অনুমতি চাইলে তাকেও একটা সিগারেট অফার করতে হয়। পারমিতা সিগারেট খায় না। কিন্তু অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। সামনের টেবিল থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালো।

নিজের সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দেবপ্রিয় বললো, "আই অ্যাম স্যরি।"

"তুমি আজ ঘন ঘন স্যরি হচ্ছো কেন দেবপ্রিয়?" মনে মনে পারমিতা বললো, "যেদিন তোমার সত্যিই স্যরি হওয়া উচিত ছিল সেদিন তুমি একটুও দুঃখ প্রকাশ করোনি।"

দেবপ্রিয় বললো, "আমি জানতাম না তুমি স্মোক করো।"

পারমিতা বুঝছে দেবপ্রিয় কোন অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বলছে। নদীর ধারে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেবপ্রিয় যখন সিগারেট টানতো, তখনই তো ওর সিগারেট জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে আঙুল পুড়িয়ে ফেলেছিল পারমিতা। ওর হাতটা টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ ফুঁ দিয়েছিল দেবপ্রিয়।

সেই প্রথম সজ্ঞানে প্রেমের পুরুষস্পর্শ পেয়ে পারমিতার শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়েছিল। অপুটা তখন ভীষণ ফচকে ছিল। পারমিতার কাছে পরে ঘটনাটা শুনে বলেছিল, "ভাগ্যে আঙুল পুড়েছিল—কোনো কারণে আঙুল কেটে গেলে তুই আরও বিপদে পড়তিস। রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আঙুল চুষে দিতো।"

সামান্য এই রসিকতায় তখন নিষ্পাপ পারমিতার গা শিউরে উঠেছিল। দেবপ্রিয় তারপর কী বলেছিল এখনও মনে আছে পারমিতার। দেবপ্রিয় আর একটা সিগারেট বার করে বলেছিল, একটা টেস্ট করে দেখো না। পারমিতা আবার শিউরে উঠেছিল। দেবপ্রিয় বুঝিয়েছিল, ছেলেরা এবং মেয়েরা স্বাধীন ভারতবর্ষে সমান। মৃদু বকুনি লাগিয়েছিল পারমিতা। ছেলেদের যা মানায় মেয়েদের সব সময় তা মানায় না।

সেই পারমিতাই আজ হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার মিটিং রুমে বসে দেবপ্রিয়কে বললো "আমার সব খবর তুমি জানবে কী করে? আমি স্মোক করি, ড্রিংক করি—আমার যা খুশী তাই করি।"

"অফিসেও তোমার খুব নাম," দেবপ্রিয় বললো।

"তাই বুঝি?" পারমিতা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো।

দেবপ্রিয় বললো, "আমার স্ত্রী তোমাকে দেখে মোহিত। অথচ তোমার সঙ্গে যে আমার পরিচয় ছিল, তা ও জানে না।"

হাতের সামনে ফাইলটা না থাকলে পারমিতা বলতো, "আমাকে লেখা তোমার কয়েকখানা চিঠি তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকীতে মণিকাকে উপহার দেওয়া যেতে পারে।"

দেবপ্রিয় বললো, "মণিকাকে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। আমরা এক অফিসে কাজ করি, এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। আমি ভাবছিলাম কথাগুলো তোমাকে বলে যাবো—এমন সময় তোমার ডাক এলো।"

পারমিতা এবার গম্ভীর হয়ে উঠলো। "অফিসের কাজেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি দেবপ্রিয়।"

প্রায় দশ মিনিট পরে দেবপ্রিয় রায় যখন পারমিতা মুখার্জির ঘর

থেকে বেরিয়ে এলো তখন তার মুখ কালো হয়ে উঠেছে। প্রোডাকশন ইনজিনীয়ার বাসু রাস্তায় জিজ্ঞেস করলেন, "মুখ এমন গোমড়া হয়ে উঠলো কেন রায়সাহেব ? গৃহিণীর সঙ্গে সকালে ঝগড়া করেছেন নাকি ?"

দেবপ্রিয় একটু হাসবার চেষ্টা করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। ম্যানেজার মিস্টার শর্মা এবার পারমিতার ঘরে ঢুকলেন। পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "কারখানার কোনো জিনিস বিক্রি করতে হলে আপনার অনুমতির প্রয়োজন হয় না ?"

শর্মা বললো, "অবশ্যই হয়। কিন্তু আমি শুধু রবার স্ট্যাম্প। কোন মেশিন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে তা বিচার করেন প্ল্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার। তিনি সার্টিফিকেট দিলে আমি সই করি। তারপর সেই ঝড়তিপড়তি মল বিক্রির ব্যবস্থা হয়।"

পারমিতা কেন এসব প্রশ্ন করছে, শর্মা ঠিক বুঝতে পারছেন না। পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "যখন মিস্টার পোদ্দারের দল এই কোম্পানিতে রাজত্ব করেছেন, তখনও তো আপনি এখানে কাজ করেছেন ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তখন আমি ওয়ার্কস ম্যানেজার ছিলাম না," শর্মা উত্তর দিলেন।

"কিন্তু এই কারখানাতেই তো রোজ কাজ করছিলেন ?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"তা করেছি—এবং সত্যি বলতে কি, সমস্ত কারখানার পরিবেশ তখন বিষিয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন লেভেলে তখন মিস্টার পোদ্দারের লোকেরা ঢুকে পড়েছে। কে যে কারখানার কথা ভাবছে এবং কে যে কোম্পানির স্বার্থ দেখছে তা বুঝতে পারতাম না। বিশেষ করে ম্যানেজার মিস্টার চোপরা যে পুরোপুরি পোদ্দারের পকেটে চলে গিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।"

এইবার পারমিতা জিজ্ঞেস করলো, "প্ল্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার দেবপ্রিয় রায় সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ?"

গম্ভীর হয়ে উঠলেন শর্মা। "নির্দিষ্ট কিছু না জেনে কোনো অফিসার সম্বন্ধে মন্তব্য করা কি ঠিক হবে?"

পারমিতা বললো, "মিস্টার রায়ের পার্সোনাল ফাইল তো আপনার কাছেই রয়েছে।"

ফাইলটা ঘেঁটে শর্মা কিছুই বলতে পারলেন না। পারমিতা চোখ থেকে চশমাটা খুলে লক্ষ্য করলো পোদ্দার-আমলে দেবপ্রিয়র মাইনে হঠাৎ পাঁচশো টাকা বেড়েছিল। পারমিতা এ-সম্বন্ধে কিছু বললো না। তবে ফাইলটা ফেরত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "বাই দি বাই, গত কয়েক বছর অফিসারদের ইনক্রিমেন্টের হার কেমন ছিল?"

"খুব ভাল নয়। কোম্পানির ফাইনানসিয়াল অবস্থা খারাপ তখন।" শর্মা বললেন।

তা হলে ব্যাপারটা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে পারমিতার কাছে। যে মেশিনে এখনও অনেকদিন কাজ চলে সেই মেশিনকে বাতিল করে সার্টিফিকেট ইস্যু করলো দেবপ্রিয় রায়। মেশিন জলের দামে বিক্রি হলো—বেনামে কিনলেন পোদ্দার স্বয়ং। সেই মেশিন তারপর চালান হলো নৈনিতে পোদ্দারের বেনামা কারখানায়। দেবপ্রিয় রায়ের মাইনে বাড়লো—আরও টাকা এসেছে কিনা কে জানে?

দেবপ্রিয় রায়ের বাড়িতে যাবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না পারমিতার। কিন্তু মণিকা নিজেই গেস্ট হাউসে এলেন। প্রায় জোর করেই তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। তাঁর সাজানো সোনার সংসার দেখাবেন পারমিতাকে।

হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার অফিসারস্ কোয়ার্টার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সামনে এক ফালি সবুজ মাঠ। তারপর গাড়ি দাঁড়াবার পর্চ। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেই বিরাট হল্ ঘর। ঘরের অর্ধেক কার্পেট মোড়া। অনেকগুলো সোফা রয়েছে সেখানে।

দেবপ্রিয়র এই সাজানো সংসারে পারমিতাকে অভ্যর্থনা করলেন মণিকা। কিছুক্ষণ সাধারণ গল্পগুজব করেই মণিকা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন।

নিজের উৎসাহে পারমিতাকে সমস্ত কোয়ার্টার ঘুরিয়ে দেখালেন। এমনকি শোবার ঘর—যেখানে জোড়া খাট রয়েছে। শয়ন মন্দিরেও পারমিতাকে ঢোকাতে চেয়েছিলেন মণিকা ; কিন্তু পারমিতা উৎসাহ দেখালো না, বললো, "বাইরের ময়লা ওখানে না ঢোকানোই ভাল।"

মণিকা এবার সোৎসাহে আলমারি থেকে নিজেদের ফ্যামিলি অ্যালবাম বার করলেন। এবং ড্রইং রুমে ফিরে এসে দুখানা মোটা অ্যালবাম পারমিতার সামনে রাখলেন। অনুমতির অপেক্ষা না করেই মণিকা নিজেদের অ্যালবাম খুলে দেখালেন পারমিতাকে। প্রথম পাতায় রয়েছে দেবপ্রিয়র পুরনো একটা ছবি—সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মণিকা বললেন, "কীরকম বোকাবোকা দেখতে ছিল লক্ষ্য করুন।"

চুপ করে রইলো পারমিতা। মণিকা বললেন, "তখন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে ও। একেবারে গাঁইয়া ছিল। বিয়ের পরে ওকে মানুষ করলাম আমি।"

দেবপ্রিয় চুপচাপ রইল। সে হল্-এর এক কোণে একটা বই খুলে গম্ভীরভাবে বসে আছে। মণিকা বললেন, "ওর প্রতিবাদ করবার সাহস নেই। কারণ আমার হাতে না পড়লে সত্যিই ও একটা গাঁইয়া থেকে যেত।"

"আপনি আমাদের বিয়ের ছবিগুলো দেখুন, আমি ততক্ষণে কিচেন থেকে ঘুরে আসছি।" এই বলে মণিকা ভিতরে চলে গেলো।

আর পারমিতা নবদম্পতির রঙীন ছবি দেখতে দেখতে চোখ বুজলো।

দেবপ্রিয়র ভরসায় শীতলপুর টাউনের পারমিতা তখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল।

দেবপ্রিয়র মুখ চেয়ে সে শুধু পরের পর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেয়নি, বাবা-মায়ের বিরক্তিও অর্জন করেছে। মা বলতেন, "কম বয়সে বিয়ে হওয়াই ভাল। কচি কচি বর-বউ বেশ দেখায়। ঝুনো নারকেল হয়ে যারা বিয়ে করে তারা বোকা।" পারমিতা মাকে গ্রাহ্য করেনি, তার কারণ দেবপ্রিয়র ভরসা।

দেবপ্রিয় কতদিন শুধু পারমিতাকে একটু দেখবার জন্যেই কলেজ থেকে দশ মাইল সাইকেল চালিয়ে মামার বাড়িতে চলে এসেছে। "আজ তো শনিবার নয়?" পারমিতা জিজ্ঞেস করেছে।

"হঠাৎ তোমাকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগলো," দেবপ্রিয় উত্তর দিয়েছে।

মনে মনে খুব খুশী হয়েছে পারমিতা। কিন্তু সেই সঙ্গে ভয় হয়েছে দেবপ্রিয় পরীক্ষায় না খারাপ করে বসে। গম্ভীরভাবে বলেছে, "এই শেষ। পরীক্ষায় খারাপ হলে দোষটা হবে আমার। আমি চাই পরীক্ষায় তুমি ভাল করো দেবপ্রিয়।"

পারমিতার মনে আছে সামনেই তখন দেবপ্রিয়র পরীক্ষা। পারমিতা বার বার বলেছে, "সামনে তিন সপ্তাহ তুমি মন দিয়ে পড়ো, হোস্টেল থেকে বেরিয়ো না, আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা কোরো না।"

তবু শনিবার দিন দেবপ্রিয়র সাইকেলের ঘন্টা অনেকক্ষণ ধরে পারমিতার বাড়ির সামনে বেজেছিল। বাঁশি বাজিল ওই বিপিনে! সাইকেলের আরোহীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করবার দুর্বার আগ্রহ পারমিতাকে চেপে ধরেছিল। কিন্তু পারমিতা সেই দিনই পড়েছে, "মহৎ প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়।" পারমিতা দেখা করেনি: তার বদলে অজয়ের হাতে চিঠি পাঠিয়েছে—'লেখাপড়া করে যে....পায় সে।'

দেবপ্রিয়র সেদিন অভিমান হলেও পরে নিজের ভুল বুঝেছে। পরীক্ষার শেষে জিজ্ঞেস করেছে, "তোমার চিঠিতে ডট ডট ছিল। লেখাপড়া করলে কী পাওয়া যায় তা লেখোনি।"

হেসে ফেলেছিল পারমিতা। "লেখাপড়া করলে কী পাওয়া যায় জানো না? পুরস্কার।"

কী পুরস্কার তা সেদিন ব্যাখ্যা করেনি পারমিতা। দেবপ্রিয় তখন জামসেদপুরে নিজেদের বাড়িতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। সেই ছুটিতে দুজনের মধ্যে অনেক পত্র-বিনিময় হয়েছে। মুখে যা বলা সম্ভব হয়নি, লেখায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেবপ্রিয়র চিঠি পড়ে পারমিতার মনে হয়েছে

প্রিয়াকে না দেখে দেবপ্রিয়র জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। শয়নে স্বপনে জাগরণে দেবপ্রিয়র একটি স্বপ্ন—পারমিতা।

তারপর যেদিন পরীক্ষার ফল বেরোবার কথা সেদিন উত্তেজনায় পারমিতা ছটফট করেছে। তার কয়েকদিন আগেই দেবপ্রিয় মামার বাড়িতে ফিরে এসেছে।

সাইকেল রিকশায় চড়ে বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে পারমিতা সেই নদীর ধারে চলে গিয়েছে। দেবপ্রিয়কে বলেছে, "ফল জানামাত্রই তুমি সোজা বটগাছ তলায় চলে আসবে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

পারমিতার মনে পড়ছে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একবার ভয় হলো, নিশ্চয় কোনো দুঃসংবাদ আছে, তাই দেবপ্রিয়র দেখা মিলছে না। আড়াই ঘণ্টা দাঁড়ানোর পরে দূর থেকে দেবপ্রিয়র সাইকেল দেখা গেলো। ওর সাইকেল চালানোর ছন্দ দেখেই পারমিতা আন্দাজ করেছিল, খবর ভাল হবে। সত্যি ভাল ফল করেছিল দেবপ্রিয়। সাইকেল থেকে নেমে দেবপ্রিয় বললো, "রেজাল্ট টাঙাতে দেড়ঘণ্টা দেরি করে দিলো। না-হলে কখন চলে আসতাম। সমস্ত পথটা তাই ঝড়ের বেগে এসেছি।"

বিরাট বটগাছটা নদীর প্রায় ওপর থেকে উঠে এসেছে। গাছটাকে পিছনে রেখে নদীর দিকে মুখ করে বসলে মনে হয় যেন কোনো শান্ত নির্জন তপোবন। দূর থেকেও এখানকার কিছু দেখা যায় না। তার ওপর গ্রীষ্মের তপ্ত অপরাহ্ণ—নিতান্ত জরুরী কাজ ছাড়া এই সময়ে শহরের কেউ রাস্তায় বের হয় না।

বটগাছে একটা বিরাট ঝুরির ওপর ঠেস দিয়ে পারমিতা বলেছিল, "অত তাড়াতাড়ি করবার কী ছিল? আমি তোমার জন্যে যতক্ষণ প্রয়োজন অপেক্ষা করতাম।"

দেবপ্রিয় সেদিন পাস করার আনন্দে হাল্কা মেজাজে ছিল। নতুন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব হয়ে তার যেন সাহসও বেড়ে গিয়েছে। সে বলেছিল,

"বা রে! প্রাইজ নিতে হবে না?"

"প্রাইজ আবার কিসের?" পারমিতা মিষ্টি হেসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

"ডকুমেন্টে প্রমাণ আছে, ভালভাবে পাস করলে পুরস্কার দেবে বলেছিলে।"

পারমিতা বলেছিল, "সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। তুমি যা পুরস্কার চাইবে তাই পাবে।"

চোখ দুটো বড় বড় করে দেবপ্রিয় ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল, কী পুরস্কার চায় সে। বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল পারমিতা। কিন্তু নিজেই যখন রাজী হয়ে গিয়েছে, তখন সামান্য একটা দৈহিক পুরস্কার দিতে সে আজ দ্বিধা বোধ করবে না। বেশ লজ্জা লেগেছিল পারমিতার। চারদিকে ভালভাবে তাকিয়ে ছিল ওরা দুজনে। কিন্তু বটগাছের ডালে কয়েকটা কাক ছাড়া কাছাকাছি আর কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না।

পুণ্য-প্রবাহিনী গঙ্গা সাক্ষী রেখে একরকম জোর করেই ভীরুকম্পিত পবিত্রযৌবনা পারমিতাকে সেদিন দেবপ্রিয় তার বুকে টেনে নিয়েছিল—ওর পরিপুষ্ট কুমারী বক্ষের কোমলতা সমস্ত দেহ দিয়ে পরিমাপ করেছিল দেবপ্রিয়; তারপর ওর তপ্ত অমলিন সিক্ত ওষ্ঠ চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছিল দেবপ্রিয়। এই পুরস্কারে সন্তুষ্ট না হয়ে দেবপ্রিয় জোর করে আর একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পারমিতাকে। অবশেষে নিমেষে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে নিয়েছিল পারমিতা। উত্তেজনায় তার বুক তখন কাঁপছে। ভীরু চোখে অনভিজ্ঞা পারমিতা তখন দেখেছে দেবপ্রিয়র মুখের অবস্থা। গিনি সোনার মতো সোনালী রোদের আভা এসে পড়েছে ইঞ্জিনীয়ার সায়েবের মুখে। ভারি ভাল লাগছে তাকে। পুরস্কার দিতে গিয়ে নিজেই যেন পুরস্কার পেয়েছে পারমিতা।

কিন্তু বেশ ঘামছিল পারমিতা। ব্লাউজটা ওই খটখটে রোদে ভিজে চপচপ করছে। নাকের ডগায় মুক্তোর মতো কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছিল। দেবপ্রিয় নিজের রুমাল বার করে ওর নাক মুছে দিয়েছিল।

তারপর দেবপ্রিয় ওকে সাইকেলের পিছনে চড়িয়ে শহর পর্যন্ত নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু কে দেখে ফেলবে তার ঠিক নেই। পারমিতা রাজী হয়নি। ওর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে গুরুদ্বারের সামনে সাইকেল-রিকশা স্ট্যান্ড পর্যন্ত এসেছিল। ওইখানে ওকে রিকশাতে তুলে দিয়ে দেবপ্রিয় বিদায় নিয়েছিল। আজই সে জামশেদপুরে ফিরবে—বাবা মাকে খবর দিতে।

তারপর? তারপরের কথা ভাবতে গিয়ে পারমিতার সমস্ত শরীর রাগে অপমানে অবশ হয়ে আসে।

"কী হলো? ঘামছেন কেন?" মণিকা ফিরে এসেছেন কিচেন থেকে।

পারমিতা যেন স্মৃতির অভিশাপে পাষাণী হয়েছিল—এতোক্ষণে সে আবার নড়েচড়ে বসলো। মণিকা বললেন, "এয়ার কুলারটা বোধহয় তেমন কাজ করছে না। একটু বাড়িয়ে দেবো?"

হাত-ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে আলতোভাবে নাকটা মুছে নিলো পারমিতা।

মণিকা বললেন, "ওই বিয়ের ছবিটা চমৎকার না? ছবি তোলাবার জন্য বাবা ক্যালকাটা থেকে স্পেশাল ফটোগ্রাফার আনিয়েছিলেন। নাম শুনেছেন নিশ্চয়—আমেদ আলী।"

পারমিতা চোখ বন্ধ করতে চাইছে। কিন্তু মণিকা শুনবেন না। বললেন, "পরের ছবিটাও আমেদ আলীর তোলা—দমদম এয়ারপোর্টে।"

পারমিতা কথা বলতে পারছে না। মণিকা সোৎসাহে বললেন, "সবাই বলে এই ছবিটাতে আমাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে। তা বলুন তো বিশ্রী দেখাবে না? তার আগের দিন সারারাত আমি কেঁদেছি। বিয়ের এক সপ্তাহ পরে স্বামী বিদেশে লম্বা সময়ে চলে গেলে, স্ত্রীর চোখ দুটো ফুলো-ফুলো দেখাবে না? আপনি বলুন।"

পারমিতার কান দুটো বেশ গরম হয়ে উঠেছে। মণিকা এবার স্বামীকে বকুনি লাগালেন। "আড়াই মাইল দূরে বসে রইলে কেন? কাছে সরে এসো না?"

দেবপ্রিয় বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু স্ত্রীর অবাধ্য না হয়ে দেবপ্রিয় কেমন সুড়সুড় করে আরও একটু কাছে এগিয়ে এলো। মণিকা বললেন, "এক বছর ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। গ্লাসগোতে ও একটু গুছিয়ে বসতেই, ছ' সপ্তাহ পরে আমি ওখানে উড়ে গেলাম। পরের ছবিটা দেখুন, লণ্ডনের ট্রাফাল্গার স্কোয়ারে আমি আর ও পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছি।"

সেই ছবিটাও দেখতে হলো পারমিতাকে। মণিকা বললেন, "ওকে বিলেত পাঠাতে গিয়েই বাবার কত খরচ হয়ে গিয়েছিল। তারপর এক মাসের মধ্যে আমি বায়না তুললাম বিলেতে যাবো। বাবার কষ্ট হবে জেনেও আমি নাছোড়বান্দা। আপনি ভাবছেন শুধু বিরহ?"

পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। টেলিফোন ধরবার জন্যে দেবপ্রিয় উঠে গেলো। মণিকা বললেন, "মোটেই না। পুরুষমানুষদের কখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। আপনারও তো একদিন বিয়ে হবে—কখনও পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করবেন না। আমার কী হয়েছিল শুনুন। হঠাৎ একটা উড়ো খবর পেলুম—ওঁর নাকি মামার বাড়ির কাছে একটি ইয়ে ছিল। আমার ভয় হলো ইয়েটি যদি আবার বিলেত ধাওয়া করে। তাই বাবার ধার-করা টাকা দিয়ে আমি বিলেত চলে গেলুম।"

পারমিতা আবার রুমালে মুখ মুছলো। মণিকা বললেন, "ইয়ের ব্যাপারটা ও অবশ্য অস্বীকার করলো। বললো সব বানানো।"

দেবপ্রিয় ফিরে এসে বললো, "রাত্রে আবার একটু ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। একটা মেশিন হঠাৎ ব্রেকডাউন হয়েছে।"

মণিকা রায় বললেন, "কারখানার লোকদের কখনও বিয়ে করবেন না। এদের মেশিনগুলো যে কখন বেঁকে বসবে তার কিছুই ঠিক নেই।"

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পারমিতা কারখানার গেস্ট হাউসে ফিরে এসেছে। শরীরটা মোটেই ভাল লাগছে না। গেস্ট হাউসের বেয়ারা সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিছু প্রয়োজন আছে নাকি?

দোতলার বারান্দায় বসে পারমিতা হ্যারিংটন টাউনশিপের বিরাট

বিরাট গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। আর ভাবছে, আগামীকাল কীভাবে আবার তদন্ত শুরু করবে। নিজের দুশ্চিন্তা ভুলবার জন্যে পারমিতা ছোট একটা জিনের অর্ডার দিয়েছে। জীবনে দ্বিতীয়বার জিনের স্বাদ নিতে নিতে পারমিতার বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। বিহারের পুরনো শহরের ছোট বাড়িটায় বসে বাবা মা কি কল্পনা করতে পারবেন, তাঁদের মেয়ে একলা বসে মদ খাচ্ছে?

কিন্তু অনেক কিছুই তো আগেভাগে কল্পনা করা যায় না। পারমিতা যেদিন সরল বিশ্বাসে দেবপ্রিয়কে পুরস্কার দিয়েছিল সেদিন কি পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে কল্পনা করতে পেরেছিল সে? সে কি ভেবেছিল, দেবপ্রিয়র সঙ্গে তার দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা থাকবেই না।

দেবপ্রিয়কে তারপর কয়েকখানা চিঠি দিয়েছে। কোনোটার উত্তর আসেনি। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে শ্বশুরের টাকায় বিলেতে যাবার প্রলোভনে দেবপ্রিয় তখন শীতলপুর টাউনের একটা সাধারণ মেয়েকে নির্মমভাবে ভুলে গিয়েছে। মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে বুবুরা ফিরে এসেছে। বুবু বলেছিল বটে, "কী টুকটুকে বউ হয়েছে দেবুদার।"

পুরস্কার নেবার ঠিক এক সপ্তাহ পরে সে যে নির্লজ্জের মতো অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে তা ভাববারও তার ক্ষমতা নেই। পারমিতা তার জীবনের ধারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। কয়েকটা সম্বন্ধ এনেছিলেন বাবা। কিন্তু তখন পড়াশোনায় মন দিয়েছে পারমিতা। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে—নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা? নত করি মাথা পথপ্রান্তে কেন রব জাগি ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশায় পূরণের লাগি দৈবাগত দিনে।

পড়াশোনায় আকস্মিক অভাবনীয় উন্নতি করেছে পারমিতা। পরীক্ষায় সবার থেকে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গিয়েছে সে। নিজেকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন তখন তার ছিল না। বাবা মা ভিতরের ব্যাপার জানতেন না, তাঁরা খুশী হয়েছেন। বিশেষ

করে বাবা বলেছেন, ছেলেদের থেকে মেয়েরা কম কিসে? মা যদিও বাবার সঙ্গে একমত হননি, তবু পড়াশোনায় বাধা দেননি।

পড়ার নেশায় মেতে থাকলেও প্রবঞ্চনার গ্লানি থেকে পরিপূর্ণ নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি পারমিতা। খুব ইচ্ছে হয়েছে, দেবপ্রিয়র মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে বলে, যাকে খুশী বিয়ে করার অধিকার অবশ্যই সবার আছে। কিন্তু একজন নিষ্পাপ মেয়েকে তুমি কলুষিত করলে কেন?

আজ এতোদিন পরে ঘড়ির কাঁটা এইভাবে ঘুরবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি পারমিতা। সংসারের বিচিত্র কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পারমিতা মুখার্জির হাতে দেবপ্রিয় রায় এমনভাবে ধরা পড়বে তা কে জানতো? সার্থক হয়েছে পারমিতার সাধনা—দেবপ্রিয় রায়ের ফাইলটা এখন পুরোপুরি তার হাতে।

গেস্ট হাউসের গেট খোলবার আওয়াজ হলো যেন। আবছা অন্ধকারে গেট বন্ধ করে কে যেন বাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। দেবপ্রিয় না?

খিলখিল করে হাসতে ইচ্ছে করছে পারমিতার। আট বছর আগে কত সাধ্যসাধনা করেও যার কাছ থেকে এক লাইন উত্তর পায়নি, সে আজ চুপি চুপি অনাহূতের মতো তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উপরে উঠে আসছে।

কলিং বেলের আওয়াজ হলো। বেয়ারা অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে। পারমিতা নিজেই দরজা খুলে দিলো। দেবপ্রিয় পাথরের মতো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেবপ্রিয় বললো, "আমি ভাবলাম তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি।"

"ক্ষমা?" খিলখিল করে হাসতে ইচ্ছে করছে পারমিতার। "ক্ষমার বুঝি তামাদি হয় না, দেবপ্রিয়? তার বুঝি কোনো সময়সীমা নেই।"

দেবপ্রিয় বললো, "ক্ষমা হয়তো তুমি করবে না! কিন্তু তোমায় শুধু জানাতে এসেছি যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল তখনও মণিকার কথা আমি জানতাম না।"

তারপর হাউ হাউ করে দেবপ্রিয় কী সব বলে গেলো, যা পারমিতার মাথায় ঢুকেও ঢুকলো না। পরের পয়সায় বিলেত গিয়ে আত্মোন্নতির নেশায় বিয়ের ফাঁদে পা দিয়েছিল দেবপ্রিয়। বাবার প্রস্তাবে তেমন প্রতিবাদও করেনি। তারপর দিন ছয়-সাতের মধ্যে কী যে হয়েছিল।

পারমিতা বললো, "আই অ্যাম স্যরি। এখন তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই আমার। আগামীকাল অফিসেই তো দেখা হচ্ছে।"

বেশ বোঝা যাচ্ছে লোকটাকে। এই লোকটার কথা ভেবে মিথ্যা অভিমানে নিজের জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে পারমিতা। শ্বশুরের পয়সায় বিলেত যাওয়ার লোভে সে পারমিতাকে ত্যাগ করেছিল; এই এতোদিন পরে পোদ্দারের পয়সার লোভে সে আবার কারখানার মেশিন বেচে দেবার কাগজে সই করবে তাতে আশ্চর্য কী?

হঠাৎ যেন নিজেকে মার্চেন্ট অফ ভেনিসের পোর্সিয়ার মতো মনে হচ্ছে। পারমিতার কলমের খোঁচায় দেবপ্রিয় রায়ের সোনার সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। দেবপ্রিয় রায়ের চাকরি এখন তারই ওপর নির্ভর করছে, যাকে সে একদিন চরম অবমাননা করেছিল। শুধু চাকরি থেকে সাসপেন্ড নয়—সি বি আই, কোর্টে মামলা, জেল, চাকরি থেকে বরখাস্ত—পরের পর ছবিগুলো পারমিতার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাইরে আবার গেট খুলবার আওয়াজ পাওয়া গেলো। মনের সুখে শিস দিতে দিতে কে যেন এদিকেই আসছে। টোনি মায়ার এতো রাত্রে কোথায় গিয়েছিল?

পারমিতাকে দেখে টোনিও বেশ অবাক হয়ে গেলো। "এখানে? তুমি কী করছো?"

"কাজ, কাজ, কাজ—কত রকমের কাজ থাকে অফিসে জানো তো", পারমিতা বললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে এতো রাত্রে?"

টোনি মায়ার বললো, "সন্ধেবেলায় মালির সঙ্গে কথা বলতে বলতে

ম্যাজিক ম্যারেজ ফ্লাওয়ার নিয়ে বেরিয়েছিলাম। যদি কোনো সুযোগ এসে যায়।"

"এনি লাক?" রসিকতা করলো পারমিতা।

"প্রায় আড়াই মাইল পথে একজন লেডিকে দেখলাম—ভেরি ওল্ড লেডি রাস্তা থেকে কাউ ডাং তুলছেন। একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম আমি।"

"কেন?" পারমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"আমি অনেক ইন্ডিয়ান রূপকথা পড়েছি। ভোরবেলায় যাকে দেখবো তাকেই বিয়ের প্রস্তাব করবো এমন পণ করে কেউ কেউ নাকি রাস্তায় বেরোয়।"

আবার হাসির হুল্লোড়। কিন্তু সময় সংক্ষেপ। পারমিতা ও টোনি দুজনেই ব্রেকফাস্ট শেষ করে ফ্যাকটরির পথে বেরিয়ে পড়লো।

সারাদিন ওই দুর্নীতির ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহ করেছে পারমিতা। অনেকক্ষণ ধরে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করেছে দেবপ্রিয়কে। জিজ্ঞেস করেছে, "আপনি জানেন, কীভাবে পোদ্দাররা এই সব কোম্পানির সর্বনাশ করে নিজেদের মোটা করে?"

দেবপ্রিয় অতশত খোঁজ রাখে না। পারমিতা বলেছে, "এরা রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। প্রথমেই হিসেব বিভাগটিতে এরা নিজেদের লোক বসায়। তারপর আয়ত্তে আনে পারচেজ ডিপার্টমেন্ট। যে জিনিসের দাম একশ টাকা সেই জিনিসই বেনামে কোম্পানিকে সাপ্লাই করে এরা দুশো টাকার বিল করে। তারপর এরা কোম্পানির তৈরি মালের এজেন্সি ভাইপো, ভাইঝি ভাগ্নীজামাইয়ের বেনামে নিয়ে নেয়—যে জিনিস বেচে একশ টাকা পাওয়া যেতো, তার জন্যেই এরা আশি টাকা ঠেকিয়ে দেয়। বেশি দামে কোনো এবং সস্তায় বেচো এই পলিসিতেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি পোদ্দার। কারখানার ভাল মেশিনগুলো বেচবার মতলব এঁটেছিল—এবং আপনারা কেমন ভাল মেশিনগুলোকে মেরামতের অযোগ্য বলে সার্টিফিকেট দিলেন?"

মাথা নিচু করে রইল দেবপ্রিয়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

লাঞ্চের পরে আবার ডাক পড়েছিল দেবপ্রিয়র। কয়েকটা অর্ডারে সইগুলো দেবপ্রিয়র কিনা সেটা নিঃসন্দেহ হতে চাইছিল পারমিতা। সইগুলো যে তারই একথা অস্বীকার করলো না দেবপ্রিয়। পারমিতা দেখলো বেশ কায়দা করে কেস সাজানো হয়েছিল। এর আগে অন্তত দশবার মেশিনের গোলমালের জন্যে প্রোডাকশন বন্ধ থাকায় অভিযোগ রয়েছে। সেই সব অভিযোগ সই করেছেন তৎকালীন ওয়ার্কস ম্যানেজার চোপরা এবং প্রোডাকশন ম্যানেজার বোস।

পারমিতার মুখে চোখে তীব্র ব্যঙ্গের এবং ঘৃণার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছিল বোধহয়। "ছিঃ দেবপ্রিয়, তোমার কাছে এমন কাণ্ড আমি প্রত্যাশা করিনি," এমন একটা ইঙ্গিত বোধহয় দেবপ্রিয় পেয়েছিল।

দেবপ্রিয় বলেছিল, "তোমাকে একটা কথা বলবো পারমিতা ? তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি ষড়যন্ত্রের ব্যাপার বুঝিনি। চোপরা আমাকে বুঝিয়েছিল, কোম্পানির স্বার্থে ওই ধরনের সার্টিফিকেট আমাদের দরকার। কারণ মিস্টার পোদ্দার নতুন নতুন মেশিন কিনে এনে কারখানা বাড়াতে চান। পুরনো মেশিন খারাপ না দেখালে সরকার বিদেশ থেকে নতুন মেশিন আমদানী করবার লাইসেন্স দেবেন না।"

সুতরাং—সুতরাং বেচারা দেবপ্রিয় রায় জ্যান্ত মেশিনের ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে। সে জানতেও পারেনি, তার দেওয়া সার্টিফিকেটের জোরে এই সব মেশিন রাতারাতি হ্যারিংটন ইন্ডিয়া থেকে পাচার হয়ে যাবে।

যুক্তিটা মন্দ খাড়া করেনি দেবপ্রিয়। ওর সরল মুখটা দেখলে অন্য যে-কোনো মেয়ে হয়তো কথাটা বিশ্বাসও করে যেতো। কিন্তু দেবপ্রিয়, পারমিতা মুখার্জি তোমাকে যে অনেকদিন আগেই চিনেছে। বিনাপয়সায় বিলেত যাবার লোভে তুমি একজনের ভালবাসাকে পায়ে মাড়িয়ে চলে গিয়েছো।

কাজ শেষ করে পারমিতা ও টোনি দুজনে একই গাড়িতে ফিরলো। টোনি তখনও আপন মনে শিস দিচ্ছে। মাঝে মাঝে চলন্ত গাড়ি থেকে জাপানী ক্যামেরায় ছবি তুলছে। টোনি বললো, "তোমাকে এখনও এতো গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন? রাস্তায় বেরিয়ে এসেও তুমি অফিসের কথা চিন্তা করো নাকি?"

পারমিতা কি উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। একটু ভেবে বললো, "আধুনিক এক রূপকথা তৈরি করছিলাম গত রাত্রে শুয়ে শুয়ে। খানিকটা গিয়ে আটকে গেলো—সেই থেকেই ভাবছি।"

"ভারি মজার তো! রূপকথা আমারও ভাল লাগে খুব। শুনি তোমার গল্পটা।"

"কিন্তু শেষ করতে পারছি না যে।"

টোনি বললো, "তাতে কী? শুনি তোমার রূপকথার সমস্যাটা। হয়তো আমি কোনো সাহায্য করতে পারি।"

বাইরে তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সত্তর কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চলেছে কলকাতার দিকে। হাওয়ায় নিজের বুকের কাপড় সামলাতে সামলাতে পারমিতা বললো—"গল্পটা এই রকম। কোন রূপকথার দেশে সরলা এক বালিকার সঙ্গে দেখা হলো রাজপুত্রের। রাজপুত্র সেই দেশে জ্ঞানার্জনে এসেছিল। রূপকথায় যা হয়ে থাকে, দুজনের মধ্যে প্রণয় হলো। রাজপুত্র একদিন প্রেয়সীকে আংটি পরিয়ে দিলেন।"

"আংটি।" একটু খুঁতখুঁত করলো টোনি। বললো, "অনেকটা স্টোরি অফ শকুন্তলার মতো মনে হচ্ছে।"

হেসে ফেললো পারমিতা, "বেশ বাবা! তুমি তো আমাদের রামায়ণ

মহাভারতের সব গল্প জেনে বসে আছো। আমি নায়িকার কাছ থেকে আংটি ফিরিয়ে নিয়ে, গল্পটাকে আরও আধুনিক করে দিচ্ছি। আংটির বদলে রাজপুত্র প্রেয়সীর ওষ্ঠে এবং দেহে প্রেমচুম্বন এঁকে দিলেন—সাক্ষী রইলো নদী, বৃক্ষ এবং পক্ষী। তারপর রাজপুত্র বললেন, আমি কয়েকদিনের জন্যে রাজ্যে যাচ্ছি—শীঘ্র ফিরে আসবো। রাজপুত্র সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। দুঃখিনী গ্রামবালিকা বুঝলো রাজপুত্র তাকে ভুলে অন্য কোনো রাজকন্যাকে অর্ধেক রাজত্বের বদলে বিয়ে করেছেন। মনের দুঃখে গ্রামবালিকা একেবারে পাল্টে গেলো। সে বললো, আমি আর সরলা গ্রামবালিকা থাকবো না—আমি যাবোই যাবো।"

"মোস্ট ইন্টারেস্টিং। এ পর্যন্ত খুব ভাল লাগছে। তারপর?" টোনি জিজ্ঞেস করলো।

পারমিতা বললো, "গ্রামবালিকা তখন অনেক বিদুষী হয়েছে। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অন্য এক সমৃদ্ধশালী নগরে বালিকা তখন বিচারিকা হয়েছে। এমন সময় একদিন নগর কোটাল সেই রাজপুত্রকেই বিচারের জন্যে তার কাছে নিয়ে এলেন। রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর বধূ। রাজপুত্র কোনোদিন স্বপ্নে ভাবেননি সেই সরলা বালিকার কাছে তাঁকে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে হবে।"

একটু থামলো পারমিতা।

"থামলে কেন?" অধৈর্য হয়ে উঠলো টোনি।

"এই পর্যন্ত এসেই আটকে গিয়েছে। এমন অবস্থায় রাজপুত্রের প্রতি গ্রামবালিকার ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত? তার মানসিক অবস্থা তখন কী রকম? হাজার হোক এই পুরুষটির জন্যেই তার জীবনে বিপর্যয় এসেছে।"

হা-হা করে হেসে উঠলো টোনি। "সামান্য সমস্যা। আমার তো মনে হয় বালিকাটির উচিত রাজপুত্রকে প্রথমেই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানানো।"

"কেন?" বেশ রাগের সঙ্গেই প্রশ্ন করলো পারমিতা।

"এই সব চরিত্রের মালিক তুমি—সুতরাং গ্রামবালিকা রাজপুত্রকে দেখে থাপ্পড় মারলেও আমাদের কিছু বলবার নেই। কিন্তু যে-কোনো ইউরোপীয়ান বা মার্কিনীকে জিজ্ঞেস করো সে বলবে রাজপুত্র 'ডিচ' না করলে গ্রামবালিকা কোনোদিন বিদুষী বিচারিকা হতে পারতো না—সেই পুরনো একঘেয়ে জীবনেই সে পড়ে থাকতো?"

এটা মন্দ বলেনি টোনি মায়ার। পারমিতা বললো, "এই দিকটা আমার মাথায় আসেনি।"

"রাজপুত্রের এরপর কী হবে?" টোনি জানতে চাইলো।

"এরপর এখনও ভেবে দেখিনি। যদি অপরাধ করে থাকে শূলে চড়বে, যদি অপরাধ না করে থাকে মুক্তি পাবে। বিচারিকাকে এখন সেসব খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তবে তুমি যখন বলছো, গ্রামবালিকা আর কোনো ব্যক্তিগত অভিযোগ রাখবে না রাজপুত্রের বিরুদ্ধে।"

শিশুর মতো হাসলো টোনি মায়ার। বললো, "আমাদের দেশ হলে, রাজপুত্রকে বুদ্ধি দিতাম এক নম্বর বউকে ডাইভোর্স করে আবার পুরনো প্রেয়সীকে গ্রহণ করো।"

"এটা কোনো ইন্ডিয়ান রূপকথার শেষই হলো না। রাজপুত্র যাকে বিয়ে করেছে সে তো কোনো দোষ করেনি—সে কেন বিনা অপরাধে শাস্তি পাবে?"

টোনি প্রশ্ন করলো, "তুমি কি বলতে চাও রূপকথার কোনো চরিত্র বিনা দোষে কষ্ট পায় না?"

"যেখানে পায় পাক, আমার গল্পে ওসব অন্যায় হবে না," এই বলে হেসে ফেললো পারমিতা। হেসে ফেলবার প্রচণ্ড চেষ্টা না করলে মুশকিল হতো—বিদেশী টোনি মায়ার দেখতো ভারত-ললনার চোখে জল চিকচিক করছে।

লেডিজ হোস্টেলে ফিরে সেই রাত্রেই রিপোর্টটা লিখে ফেলবে ঠিক করলো পারমিতা। বিছানায় বসে সবে কাজ আরম্ভ করেছে, এমন সময় প্রতিভা কাপুর ঘরে ঢুকলো। প্রতিভা বললো, "বেশ মেয়ে বাবা। কোথায় রাত কাটিয়ে এলে?"

লেখায় মনসংযোগ করে পারমিতা বললো, "প্রতিভা, এখন ইয়ারকি করিস না—একজন লোকের ভাগ্য আমার ওপর নির্ভর করছে।"

প্রতিভা কাপুর বাংলা জানে। তার মুখে কোনো বাঁধন নেই। প্রতিভা বললো, "তোমাদের মতন গুড়ি-গুড়ি মেয়েদের জন্যেই তো আমার চিন্তা। একলা রাত কাটাতে গিয়ে কোথায় বিপদে পড়ে যাবে!"

"অত সোজা নয় প্রতিভা। আমার হাত ব্যাগে...."

"ছুরি আছে, এই তো? নিশ্চয় মাধবী দিয়েছিল। ওই বোকাটা প্রত্যেক ফ্রেন্ডকে ছুরি দিয়েছে, কিন্তু বলে দেয়নি মেয়েদের লাইফটা শুধু ছুরির কারবার নয়। আমি তাই ছুরিও রাখি, কারাটেও শিখেছি। আবার সেই সঙ্গে রেগুলার পিল খেয়ে যাই। এখনই তো এমাসের ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম," এই বলে নিজের হাত ব্যাগ থেকে পিলের কৌটো বার করে দেখালো প্রতিভা।

স্তম্ভিত পারমিতা এবার প্রতিভার দিকে তাকিয়েই রইলো। প্রতিভা বললো "তাকাচ্ছো কী? পুরুষমানুষেরা এই শহরে যা-খুশী করে ঘুরে বেড়াবে আর আমরা শুধু কাঁদবো এবং ফ্যাচ ফ্যাঁচ করে নাক মুছবো—আমি তার মধ্যে নেই।"

পারমিতা কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। দেশে কি নতুন যুগ এসে গেলো, মেয়েরা কি সত্যি এবার পাল্টে গেলো?

প্রতিভা বললো, "মাধবীটা যদি আমার কথা শুনতো। কতদিন বলেছি, ব্যাগে শুধু ছুরি রাখলে চলবে না, সেই সঙ্গে পিল রাখ।"

"কী হয়েছে মাধবীর?" পারমিতা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

"কাল মাধবীর নার্ভাস ব্রেক ডাউন মতো হয়েছে। পরশুদিন রাত্রে একদম ঘুমোয়নি। কাঁদতে কাঁদতে অণিমাদির কাছে এসে বললো, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো, আমাকে মেন্টাল হসপিটালে নিয়ে চলো।"

মাধবীর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলো পারমিতা।

হাসলো প্রতিভা। "দূর! ওর আবার গার্জেন কোথায়? ওর অবস্থা আমার মতো—যে মেয়ের বাবা নেই, তার আবার গার্জেন থাকে নাকি? নামকাওয়াস্তে কোনো একটা নাম লেখানো থাকে, না-হলে এইসব হোস্টেলে জায়গা পাওয়া যাবে না। মেয়েদের এই এক মুশকিল, পাঁচ বছরের খুকী থেকে পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ী পর্যন্ত সকলের গার্জেন ছাড়া যেন মেয়েদের অস্তিত্ব নেই। আমি তো হোস্টেলের খাতায় মিথ্যে একটা নাম লিখিয়ে দিয়েছি। কোনোদিন কিছু হলে খোঁজ করতে গিয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট দেখবে সে ঠিকানায় কেউ নেই।"

"মাধবীর ব্যাপার ভায়োলেট জানেন?" পারমিতা প্রশ্ন করলো।

"আমরা ওকে কিছু না বলাই ঠিক করলাম। মাধবীকে অণিমাদি জানাশোনা এক মেন্টাল হসপিটালে দিয়ে এসেছেন। দেখা যাক। আমি ছুঁড়িকে বললাম, অন্য কোনো রকম বিপদে পড়েছিস কিনা বল, আমার জানাশোনা ডাক্তার আছে। তা মাধবী উত্তরই দিচ্ছে না—শুধু বক বক করছে, আর বলছে, তোর কথাই আমার শোনা উচিত ছিল। ছুরির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পিলও রাখা উচিত ছিল। অণিমাদি আজও মাধবীকে দেখতে গিয়েছেন। আমি জোর করে সঙ্গে অমৃতা প্রীতমকে পাঠিয়েছি।"

প্রতিভার মুখের দিকে তাকালো পারমিতা। প্রতিভা বললো, "কলকাতা শহরের পুরুষমানুষগুলো এক একটা রাক্ষস। ওদের প্রেম-ফ্রেম সব মুখে—আসলে নিজেদের ধান্দায় আসে। মাধবী সব সময় বুঝতে

পারেনি। অমি অত বোকা নই—আমার কাছে এলে অন্তত খরচাপাতি করতে হবে।"

কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করছে পারমিতার। এখনই সে রিপোর্টটা লিখে ফেলতে চায়। প্রতিভা কাপুর দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে ফিরে এলো। বললো, "ও বাই দি ওয়ে, সেদিন রাত্রে যে-ভদ্রলোকের গাড়িতে চড়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিল—তার সঙ্গে তুমি জড়িয়ে-টরিয়ে পড়োনি তো?"

"কেন? কী হলো রতন গাঙ্গুলীর?"

বেশ দুঃখের সঙ্গে প্রতিভা বললো, "সেদিন রাত্রে তোমার সঙ্গে ভদ্রলোককে যখন দেখলাম, ভাবলাম বেশ ইনোসেন্ট চেহারা। কিন্তু কালকে দেখলাম রডন স্ট্রিটে আমি যে ফ্ল্যাটে ছেলেবন্ধু নিয়ে সময় কাটাতে যাই, সেইখান থেকেই বেরুচ্ছে। যে মেয়েটা তোমার রটন গাঙ্গুলীকে এনটারটেন করলো সে আবার আমার চেনা। যদি পারো তোমার ফ্রেন্ডকে একটু সাবধান করে দিও। মেয়েটা সুবিধের নয়—সুযোগ পেলে ব্ল্যাক মেলিং-এ ফেলতে পারে। শুনলুম ওঁর ডিপার্টমেন্টের ওয়ান মিস্টার সন্তোষ সিং জেনেটের সঙ্গে রটনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। লোকটা নিশ্চয় কোনো তালে আছে। মেয়েটা কিছুদিন আগে আরেকজন অফিসারের বিরুদ্ধে থানায় শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনবে বলে ভয় দেখিয়ে তাকে নাকের জলে চোখের জলে করেছে। অনেক টাকা গচ্চা দিয়ে বেচারাকে শেষ পর্যন্ত ক্যালকাটা ছেড়ে পালাতে হলো।"

সমস্ত শরীরটা ঘিনঘিন করছে পারমিতার।

এই বিরাট নগরী এবং তার লক্ষ লক্ষ মানুষ সম্বন্ধে পারমিতার ক্রমশ অস্বস্তি আসছে। নিজেকে এই পরিবেশে সে ঠিক যেন খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। বেশ ছিল পারমিতা। আট বছর ধরে অনেক চেষ্টায় সব ভুলে সে আবার নবজীবন শুরু করতে প্রস্তুত হচ্ছিল—হঠাৎ গত কয়েকদিনে সব লণ্ডভণ্ড হতে বসেছে। মোটেই ভাল লাগছে না পারমিতার।

পুরুষের লোভ, লোভ এবং লোভ—বাসনা, বাসনা এবং বাসনা এই মহানগরকে ক্রমশ ক্লেদাক্ত করে তুলছে। সুতরাং দেবপ্রিয় রায়কে ছেড়ে দেবার কোনো যুক্তি দেখতে পাচ্ছে না পারমিতা। অন্তত আদালতে পাঠাবার মতো প্রাথমিক প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে—তারপর দেবপ্রিয় যদি পারে, সেখানে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করুক।

এই ভোরবেলায় লেডিজ হোস্টেলের গেটের গোড়ায় কে দাঁড়িয়ে আছে? সকাল সকাল অফিস গিয়ে দেবপ্রিয় সম্পর্কে নোটটা শেষ করবে ভেবেছিল পারমিতা। কিন্তু বেরোবার সময় দেখা হলো মণিকার সঙ্গে। মণিকা খবর পেয়ে গত রাত্রেই কলকাতায় চলে এসেছে। তখন রাত্রি অনেক বলে পারমিতাকে জ্বালাতন করতে সাহস করেনি। এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটিয়ে এই ভোরবেলায় সে পারমিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

মণিকা যে সারারাত চোখের পাতা বন্ধ করেনি, তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যে হাসিখুশী চঞ্চল মণিকাকে পারমিতা এর আগে দেখেছে এ মণিকা যেন সে নয়। যে মণিকা নিজে থেকেই অনেক কথা বলতো সেই এখন কথা বলতে পারছে না। কারখানার উঁচু মহলে তা হলে গুজবটা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

মণিকা যা বলতে চায় তা পারমিতা ওর মেঘে ঢাকা মুখখানা দেখেই বুঝতে পারছে। পারমিতা যে রিপোর্ট দেবে তার ওপর শুধু দেবপ্রিয় নয়—একটা সংসারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

"মণিকা রায় আপনি কি জানেন, আপনার স্বামী দেবতাটি একদিন অসহায় এক মেয়েকে কেমনভাবে বঞ্চিত করেছিলেন, বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন?" কিন্তু এ-প্রশ্ন মণিকাকে করে পারমিতার লাভ কী? এই

সমাজে মণিকা রায়ও তো আর একটি অসহায়া নারী, যাকে টাকার জোরে বাবা সুপাত্রর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন। পারমিতা ভাবলো, মেয়েদের নিয়ে কী সুন্দর এক রীলে রেস চলেছে আমাদের দেশে। মেয়ের জন্ম হলো, বাবা ছুটলেন রীলে রেসে—তারপর কয়েক পাক ঘুরে কোনোরকমে মেয়েকে চালান করে দিলেন জামাই ছোকরার ঘাড়ে। সে আবার ছুটতে আরম্ভ করলো। মেয়ে ভাবলো কবে একটি পুত্র অর্থাৎ ভবিষ্যৎ গার্জেনকে সে গর্ভে ধরতে পারবে! এই ভাবেই অনন্তকাল ধরে রীলে রেস চলেছে—মেয়েরা কোনোদিন আত্মনির্ভর হলো না, নিজেদের আবিষ্কার করবার সুযোগ পর্যন্ত পেলো না।

মণিকা বললো, "আমি এসেছি বলে আপনি বিরক্ত হলেন ? বুঝতেই পারছেন স্বামীর এই বিপদে মেয়েদের না এসে উপায় থাকে না।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো পারমিতা। মণিকা অতীতের খবরগুলো পেয়েই এসেছে নাকি।

পারমিতা গম্ভীরভাবে বললো, "অফিসে প্রত্যেকের একটা দায়িত্ব থাকে জানেন তো—আমার ঘাড়েও একটা দায়িত্ব পড়েছে। কিন্তু আপনাকে এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি কারুর ওপর আমি অবিচার করবো না।"

মণিকা বললো, "আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি আমার স্বামী পোদ্দার কোম্পানীর কোনো ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ছিলেন না।"

পারমিতা কোনো উত্তর দিলো না। মণিকা বললে, "এখন ভাবছি তখন উনি চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন না কেন ? পোদ্দাররা যখন কোম্পানি নিলেন ঠিক তার কয়েকমাস পরেই বোম্বাইতে উনি একটি চাকরি পেয়েছিলেন ! কিন্তু নতুন মালিকরা ছাড়লেন না, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন—তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কত চাইবো ? আমি বললাম পাঁচশো। ওরা তাতেই রাজী হয়ে গেলো।"

"আমার সময় হয়ে যাচ্ছে," ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পারমিতা বললো। তারপর সোজা ট্যাক্সিতে বসে বললো—বি বি ডি বাগ।

যাঁরা আদালতের জজ হন তাঁদের পারমিতা এতোদিন হিংসা করতো। কেমন ধর্মাবতার সেজে উচ্চাসনে বসে থাকেন, তিনি দোষী বললেই দোষী, তিনি না বললেই না। কিন্তু আজ নিজের মাথাটাই ঘুরছে পারমিতার। দেবপ্রিয় হয়তো ঠকেছে সত্যিই, হয়তো সে কোনো ষড়যন্ত্রে ছিল না। কী আশ্চর্য! সব কিছু নির্ভর করছে, একটা মেয়ের ওপর—যে তাকে একদিন হৃদয়েশ্বর করতে গিয়ে প্রবঞ্চিত হয়েছিল। মণিকা রায় সম্বন্ধে তার কোনো দুর্বলতা ছিল না। মণিকা রায়কে ভালবাসার কোনো কারণ নেই পারমিতার। তারই জন্যে পারমিতার সাজানো স্বপ্ন তছনছ হয়েছে। বেশ হয়েছে—একদিন যার স্বপ্ন ভেঙেছিলে তুমি, এখন আলুথালু ভাবে তারই দরজার সামনে কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। কে বলে ঈশ্বর নেই, বিচার নেই?

কিন্তু! আবার আর এক চিন্তা মাথার মধ্যে উদয় হচ্ছে। অফিসে এসে নিজের ঘরে বসে চোখ বুজে পারমিতা হঠাৎ দেখলো তার সিঁথিতে সিঁদুর। আলুথালু বেশে সেই হোস্টেলের দরজায় পারমিতা নিজেই দাঁড়িয়ে আছে কোনো এক গর্বিতা উদ্ধত অফিসারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে—যার হাতে রয়েছে তার স্বামীর ভবিষ্যৎ।

মোটেই অসম্ভব নয় দৃশ্যটা! দেবপ্রিয় যদি তাকে ঠেলে ফেলে না দিয়ে, টোপর পরে ফিরে এসে বিয়ে করে নিয়ে যেতো, তা হলে ওই হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাটেই তো জীবন কাটাতো পারমিতার। তারপর সংসারে ভোগীলাল পোদ্দারের দয়ায় ওই একই বিপদ ঘটতে পারতো তার?

তখন কী বলত পারমিতা রায়? আজকের পারমিতা মুখার্জির কাছে এসে সেই পারমিতা রায় কী প্রশ্ন তুলতো? প্রশ্নটা হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকের মতো ভেসে উঠলো পারমিতার মনে। মিসেস পারমিতা রায় তখন জানতে চাইতো—যারা এই নাটের গুরু, সেই পোদ্দারদের তো আপনারা কিছু করছেন না। তাঁরা তো কেমন মজাসে আপনাদের এই শহরে রাজত্ব করছেন। তাঁদের আপনারা সরকারী টাকা ধার দিচ্ছেন, নতুন অফিস খুললে জামাই আদরের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। একের পর এক কোম্পানির

সর্বনাশ করে তাঁরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন আপনারা সুদর্শন চৌধুরীদের এনে সেখানে বসাচ্ছেন, কিন্তু আজও একজন পোদ্দারকে জেলখানায় দেখলাম না।

পারমিতার মনে পড়লো, যার সঙ্গে প্রথমে সে এই বি বি ডি বাগ এসেছিল, সেই পল্টু একদিন দেখা করতে এসে বলছিল—"মিতাদি, স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে জেলখানার ক্যাপাসিটি দশ-বারোগুণ বেড়ে গিয়েছে। যত-না ইস্কুলে এবং হাসপাতালের সীট বেড়েছে, তার থেকে ঢের বেশি জায়গা হয়েছে আমাদের জেলে। চোর জোচ্চোর ডাকাত আর একটাও বাইরে থাকবে না আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু কী হলো দেখুন।"

"কী হলো?" পারমিতা প্রশ্ন করেছিল।

"যাদের লোহার গরাদের পিছনে যাওয়া উচিত ছিল—তারা পাঁচতারা হোটেলের এয়ারকন্ডিশন বার-এ বসে সুখ ভোগ করেছে, আর কর্তারা জেলখানা ভরিয়ে ফেললেন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছোকরাদের দিয়ে। এতো ছেলেপুলেকে আমরা ধরছি যে লোহার গারদে আর জায়গা হচ্ছে না। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোকালে এতো রাজনৈতিক বন্দী ধরে রাখা হয়নি।"

সুদর্শন চৌধুরী এইসময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। নিজের ঘরে ডেকে পারমিতাকে বললেন, "বেশ চিন্তার কারণ হয়েছে। কারখানা বাড়ানো এবং রপ্তানি স্কিমটা পোদ্দার কীভাবে জানতে পেরেছে।"

চুরুট মুখে দিয়ে সুদর্শন চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, "কেমনভাবে জানতে পারলো বলো তো? তুমি কি গল্পের ছলে কাউকে কিছু বলে ফেলেছো?"

অসম্ভব। এ-সম্বন্ধে কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলেনি পারমিতা। সুদর্শন বললেন, "তুমি রমেন বসু বলে কোনো লোকের বাড়িতে যাতায়াত করো?"

"করি। তাঁর স্ত্রী অপর্ণা আমার সঙ্গে পড়তো।"

"ওদের গাড়ি করে সেদিন তুমি ভেঙ্কটের পার্টিতে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে আমি তাকে অফিসের খবর দিতে যাচ্ছি না।"

সুদর্শন বললেন, "এই রমেন বসু আবার পোদ্দারের মাইনে করা এজেন্ট। ওদের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ রেখো না। গতকাল খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার দুঃসংবাদ পেয়ে যখন আমি খুব রেগেছিলাম, তখন আমার এক তথাকথিত শুভানুধ্যায়ী ডিরেকটর তোমার সম্বন্ধে রিপোর্ট দিলেন।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পারমিতা। অফিসের রাজনীতি কত নিচে নামে তা বেচারার জানা ছিল না।

সুদর্শন বললেন, "তুমি চিন্তা কোরো না। তোমাকে সন্দেহ করলে; আমি এসব কথা বলতামই না। প্রথমে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু পরে বাড়ি গিয়ে অন্য এক গোপন সূত্র থেকে জানলাম আমার ডেপুটি চেয়ারম্যান নিজেই গোপনে পোদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আমাকে সরিয়ে সেই এখন এই অফিসে কর্তা হবার স্বপ্ন দেখছে।"

সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কারখানার কাজ কেমন হলো?"

পারমিতা বললো, "রুই কাতলা না ধরতে পারলে দুর্নীতির কিছুই হবে না। অনেক কায়দা করে পোদ্দার কারখানার মেশিন বিক্রি করেছে— ডি. পি. রায়, যিনি মেশিন খারাপ বলে সই করেছেন তিনি বোকামি করেছেন নিশ্চয়, কিন্তু তাঁর কোনো দুরভিসন্ধি ছিল বলে আমার মনে হয় না।"

"তার মানে তুমি বলছো, রায়ের নামে পুলিশে খবর দিয়ে কোনো লাভ নেই?"

শেষবারের মতো ভাবলো পারমিতা, তারপর শান্তভাবে বললো. "ওঁকে আমি বেনিফিট অব ডাউট দিতে চাই।"

সুদর্শন দ্বিমত করলেন না। পারমিতা বললো, "এ-বিষয়ে আমার বিস্তারিত রিপোর্ট আজকেই পাবেন।"

প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল পারমিতা। এখন সে কিছুটা

শান্ত বোধ করছে। একেক সময়ে মনে হচ্ছে জন্মভূমি শীতলপুর টাউনের ছোট্ট পরিধি পেরিয়ে এমনভাবে বিশাল নগরের ঘটনাস্রোতে সাঁতার না-কাটতে এলেই পারমিতার ভাল হতো। মেয়েদের এই জীবন ঠিক মানায় না—মেয়েদের এতে কোনো লাভ নেই। ইট কাঠ সিমেন্ট কংক্রিটে গড়া এই নিন্দিত নগরীর বৈশ্যতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রকৃতি ও নারীর কোনো সম্মানিত স্থান নেই। পোদ্দারের সর্বগ্রাসী আর্থিক বাসনা, রতন গাঙ্গুলীদের নির্লজ্জ দৈহিক কামনা এবং দেবপ্রিয়দের সহস্রমুখী লোভ কলকাতা ও পরিপার্শ্বকে দূষিত ও বিষময় করে তুলছে। যে মুক্তির সন্ধানে পারমিতা একদিন মফস্বল থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল, যার জন্যে দীর্ঘ আট বছর ধরে সে নিরন্তর পরিশ্রম করেছে, তাকে তো এই শহর কলকাতায় প্পাওয়া যায় না।

একটু পরেই আরও বড় খবর এলো। দিল্লী থেকে টেলিপ্রিন্টারে সুদর্শন চৌধুরীর নামে জরুরী বার্তা এসেছে। আকস্মিক এই বিস্ফোরণের জন্য সুদর্শন চৌধুরী মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। দিল্লীর উচ্চমহলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার ওপর সরকারী কর্তৃত্বের অবসান হবে। রুগ্ণ এই শিল্পকে দীর্ঘকাল ধরে লালন-পালন করার ধৈর্য তাঁদের নেই। তার জন্য যে কয়েক কোটি টাকা লগ্নী করতে হবে তা সরকার এখন ব্যয় করতে প্রস্তুত নন। মিস্টার ভোগীলাল পোদ্দারের অর্থে লালিত কয়েকজন তথাকথিত জনপ্রতিনিধি বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে কিছুদিন থেকে ভোগীলালজীর পক্ষে ওকালতি করছিলেন। সেই একই সময়ে ভোগীলালজীর মাইনে করা প্রতিনিধিরা সরকারী অফিসার মহলে জনসংযোগে ব্যস্ত ছিলেন। কোনো এক পি সি সরকারী ম্যাজিকে ভোগীলাল পোদ্দার হ্যারিংটন ইন্ডিয়াকে আবার ফিরে পাচ্ছেন। অবশ্য পোদ্দার নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবার তিনি গুডবয়ের মতো কোম্পানি চালাবেন। সরকারের সঙ্গে সব রকমের সহযোগিতা করবেন।

দিল্লীর কর্তারা জানিয়েছেন, সুদর্শন চৌধুরী যদি ইচ্ছে করেন সরকার রেকমেন্ড করবেন তাঁকে কোম্পানির চেয়ারম্যান রেখে দিতে। বিস্মিত

হতবাক সুদর্শন চৌধুরী অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, "আমি তো পাগল হইনি যে ভোগীলাল পোদ্দারের নোকরি করবো। টাকার অত দরকার থাকলে আমার হিন্দুস্তান সিগারেট কোম্পানি কী দোষ করলো?"

সুদর্শন চৌধুরী জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সরকারী কোনো উদ্যোগে ফিরে যেতে চান—' মন প্রয়োজন হলে তিনি কোনো কলেজে মাস্টারি করবেন।

পারমিতা বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। যদিও সুদর্শন চৌধুরী বললেন, "তোমার চিন্তা কি? তুমি কনফার্মড হয়েছো—এই অফিস থেকে যাবার আগে তোমার সম্বন্ধে আমি খুব ভাল রিপোর্ট দিয়ে যাবো।"

সুদর্শন চৌধুরী অফিস থেকে অনেক আগেই চলে গেছেন। পারমিতা নিজেও আজ একটু আগে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে পড়েছিল। এই অফিসে তার পক্ষে আর চাকরি করা সম্ভব হবে না!

এমন সময় টোনি মায়ার দরজায় একটা টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। টোনির দুই হাতে দুটো ব্যাগ। টোনি ভেবেছিল অন্যদিনের মতো পারমিতার মুখে সে আজও উজ্জ্বল হাসির সোনালী রোদ্ দেখবে। কিন্তু পারমিতার মুখে আজ লন্ডনের পাঁশুটে মেঘের ছায়া পড়েছে।

বিদায় জানাতে এসেছে টোনি। হ্যারিংটন ইন্ডিয়ার আকস্মিক পরিবর্তনের খবর তার কানে এসেছে। পোদ্দার অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে কাজকর্মের ইচ্ছে বিলেতের কোম্পানির নেই তা টোনির জানা আছে। বিলেতে ফিরে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দিতে চায়।

সব শুনে পারমিতা স্তব্ধ হয়ে রইলো। "আমি ভেবেছিলুম তুমি আরও কিছুদিন থাকবে।"

টোনির যে দুঃখ হচ্ছে না তা নয়। ডান হাতের ব্যাগটা পারমিতার টেবিলে রেখে টোনি বললো, "আমিও তো সেইরকম ভাবছিলাম। অনেকদিন পরে জন্মস্থানে ফিরে এসে হঠাৎ এই দেশের ওপর মায়া বাড়ছিল।"

টোনি বোধহয় এবার পারমিতাকে হাসিতে ভ[illegible]য়ে দিতে চাইলো। ভ্রূধনু ভঙ্গ করে সে বললো, "আমি ফেয়ারি টেলের খোঁজ করতে এলাম—ইনকমপ্লিট অবস্থায় গল্পটা তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে।"

হাসলো পারমিতা। বললো, "রূপকথার সেই নায়িকা বেশ অসুবিধায় আছে। রাজপুত্রের বিচার করে সে তাকে মুক্তি দিয়েছে—কিন্তু এখন সে কী করবে বুঝতে পারছে না!" টোনি বললো, "এইসব সেকেলে রূপকথার নায়িকারা যদি আধুনিক কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্টদের পরামর্শ নিতো তা হলে তারা অনেক কম কষ্ট পেতো। রূপকথার নায়িকা যদি আমাদের দেশের মেয়ে হতো তা হলে এতোক্ষণ নিশ্চয় মনস্থির করে ফেলতো।"

এতো দুশ্চিন্তার মধ্যেও টোনির এই ছেলেমানুষী মন্দ লাগছে না পারমিতার। ওকে যেন সখা মনে হচ্ছে—ওকে খুব ভালো লাগছে পারমিতার। ম্লান হেসে পারমিতা বললো, "ভাবছিলাম, রূপকথার নায়িকা সেই গ্রামবালিকাকে এবার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পাঠিয়ে দিলে কী হয়?"

পাঠাতে যদি হয় তা হলে পাঠিয়ে দাও, এই ছিল টোনির বক্তব্য। গল্পটা সম্বন্ধে তার মায়া পড়ে গেছে। টোনি বললো, "পারমিতার অর্ধসমাপ্ত ফেয়ারি টেলের পরিণতি সম্বন্ধে সে নিজেও ভেবেছিল। তার ধারণা ছিল নায়িকা কিছুতেই রাজপুত্রকে ক্ষমা করবে না : তাকে শাস্তি দেবে, শূলে চড়াবে!"

পারমিতার মুখেই টোনি মায়ার সুদর্শন চৌধুরীর পদত্যাগের খবরটা শুনলো। রাজকন্যার কথা এখন পারমিতা ভাবতে পারছে না। সুদর্শন চৌধুরী না থাকলে এই হ্যারিংটন ইন্ডিয়াতে পারমিতার চাকরি করার

কথা ওঠে না। ভোগীলাল পোদ্দারের স্পেশাল-অ্যাসিসটেন্ট হবার কোনো ইচ্ছে নেই পারমিতার।

বাঁ হাতের ব্যাগটাও টোনি মায়ার এবার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। এক মুহূর্তের জন্যে সে কী ভাবলো, তারপর বললো, "আমি যদি তুমি হতাম তা হলে রূপকথার নায়িকাকে দূর দেশে পাঠানোর আগে নিজেই একবার সাত সাগরের ওপারটা দেখে আসতাম।"

নতুন এক রোমাঞ্চ পারমিতার বুকের মধ্যে খেলা শুরু করেছে।

টোনি বললো, "লন্ডনে তোমাকে একটা কাজ যোগাড় করে দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।"

পারমিতা কী বলবে? ওর চোখে জল।

অণিমাদির এবং সকলের মন খারাপ। মাধবী ত্রিবেদী গতকাল গোপনে মানসিক হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী তার গর্ভে সন্তান ছিল। স্নেহময়ী অণিমাদি এখন মাধবীর কথা ভুলবার চেষ্টা করছেন।

পারমিতার হাত ধরে সজল চোখে অণিমাদি বললেন, "শেষ পর্যন্ত সায়েবের হাত ধরে দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়াই ঠিক করলি?"

"পালিয়ে যাচ্ছি ঠিক, কিন্তু হাত ধরলাম কই?" বিষণ্ণ পারমিতা গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো।

অণিমাদি এবার একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "ইচ্ছে যদি হয়, হাত ধরবি, কেন ধরবি না?" একটু থামলেন অণিমাদি। তারপর বললেন, "সময় কী দ্রুত পাল্টে যায়। আমাদের মা-দিদিমাদের স্বাধীন হবার ইচ্ছেই ছিল না। আমার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাহস ছিল না। সারাজীবন তাই না-ঘরকা না-ঘটকা হয়ে লেডিজ হোস্টেলের সিংগল বেডে কাটিয়ে দিলাম। তোর যখন আপন ভাগ্য জয় করবার ইচ্ছেও রয়েছে এবং সাহসও আছে—তখন দ্বিধা করিস না। ইচ্ছেমতো যেখানে খুশী বেরিয়ে পড়।"